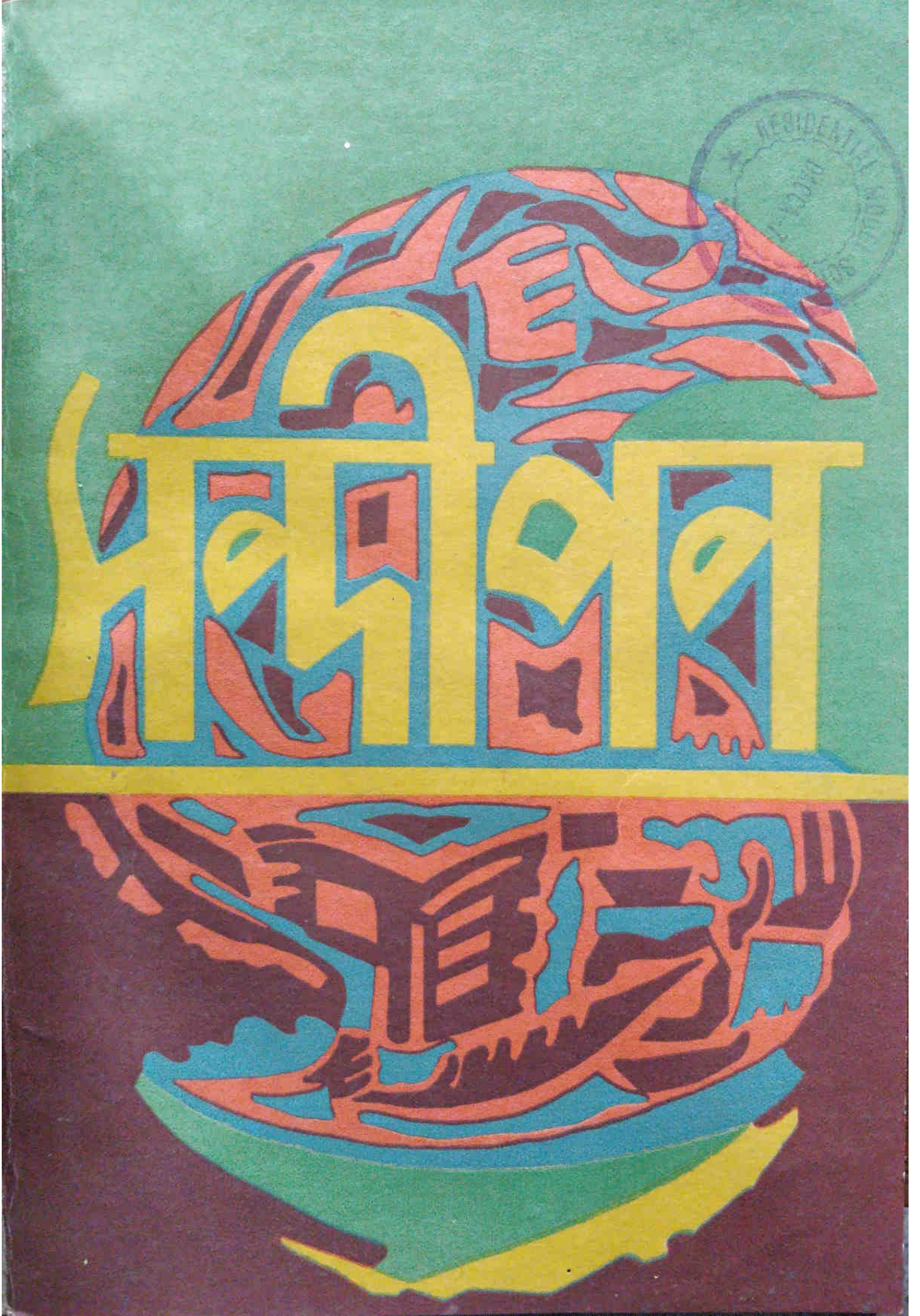

সন্দীপন

RESIDENTIAL MODEL SCHOOL LIBRARY, DACCA-7

রেসিডেনসিয়েল মডেল স্কুল বার্ষিকী

১৯৭৮ — ১৯৭৯

প্রকাশক ঃ অধ্যক্ষ
রেসিডেনসিয়েল মডেল স্কুল
ঢাকা-৭

মুদ্রণে ঃ বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা

অধ্যক্ষ, কর্নেল জিয়াউদ্দীন আহমদ

অধ্যক্ষের বাণী

বিদ্যালয়-বার্ষিকীর প্রধান স্থপতি ছাত্রবৃন্দ। তাই বার্ষিকীর প্রকাশনা স্বভাবত-ই ছাত্রদের মননশীল জীবনের গতিশীলতার স্বাক্ষর বহন করে। শুধু তাই নয়, বার্ষিকী তাদের অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞান-সাধনা, প্রতিভা-বিকাশ ও মানসিক স্ফূর্তির এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে শিক্ষার্থীদের মনো- জগতের লীলা-রহস্যের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং তাদের অন্তর-সত্তার বিকশনের নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। "সন্দীপন" এমনি একটা ক্ষেত যেখানে শিশু-কিশোর-তরুণ ছাত্রদের অনুভূতিপ্রবণ মন তার ছাপ রাখার প্রয়াস পেয়েছে, কোমল হৃদয়ের এলোমেলো ভাবনা-চিন্তা অকপটে পাখা মেলতে চেয়েছে। "সন্দীপন" আগামী দিনগুলোতে এসব অপরিপক্ক হৃদয়ের জ্ঞান-পিপাসা আর সাহিত্য-সাধনাকে আরও বেশী করে সন্দীপিত, উদ্দীপিত ও পুষ্পিত করবে-- এ আশা করতে পারি। "সন্দীপন" অনির্বাণ হোক, ছাত্রদের সাধনা সার্থক ও সুন্দর হোক আন্তরিকভাবে কামনা করি।

বিদ্যানিকেতনের এই মহতী-প্রচেষ্টায় নেপথ্যে থেকে যে সকল নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক সকল প্রকার সহায়তা যুগিয়েছেন এবং যে সকল ছাত্রদের ঐকান্তিকতার পরশে "সন্দীপন" আত্মপ্রকাশের অরুণালোকে বিদ্যায়তনের ঐতিহ্যকে সমুজ্জ্বল করছে, তাঁদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আর প্রাণঢালা অভিনন্দন।

কর্নেল জিয়াউদ্দীন আহমদ

সম্পাদকীয়

অন্তর-সত্তার বিকশন প্রয়াসই যুগে যুগে আমাদের মনুষত্বকে ব্যঞ্জনা ও ব্যপ্তি দিয়েছে। মননশীলতার বহিঃপ্রকাশই মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি। মানবহৃদয়ের সাথে তাই নান্দনিক চিন্তাধারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সাহিত্যে আমাদের এই চিন্তাধারা যুগে যুগে রূপায়িত হয়েছে—চিত্রাত্মক হয়েছে আমাদের অনুভূতি। এরই মাঝে দিয়ে আমাদের সুকুমার বৃত্তি আত্মবিকাশের তাগিদে ফুটে ওঠে--গল্পে, কবিতায়, গানেও ছড়ায়।

আত্মবিকাশের আন্তঃ প্রেরণা সাহিত্যের উৎসভূমি হলেও সাহিত্য জীবন নির্ভর। আর জীবন দেশ, কাল ও দেশকালাধীন চিন্তাসূত্রের মধ্যে আমূল প্রোথিত। পরিবেশের ঘটমান দৃশ্যপট তাই আমাদের অনুভূতিও মননশীলতায় প্রভাবক।

আমাদের এই অনুভূতিপ্রবণ মনই তার ছাপ রাখার প্রয়াস পেয়েছে এ বার্ষিকীতে।

বিদ্যালয় বার্ষিকীর মুখ্য লেখক এর ছাত্ররন্দ। সাহিত্য যদি জীবন বৃক্ষের ফুল হয় তবে যে জীবন বৃক্ষ পত্র-পল্লব-শাখা-প্রশাখায় এখনও পূর্ণতা লাভ করেনি—-সে অপরিণত জীবনবৃক্ষের কাছে প্রস্ফুটিত পুষ্প আশা করা দুরাশা মাত্র। তাছাড়া, ইন্দ্রিয়গাহ্য চেতনার পরিপোষনায় ও প্রবৃত্তি সমূহের চরিতার্থতায় মানব জীবনের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়সে লব্ধ অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতা বশতঃ এদের গল্প কবিতায় সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জটিলতার আভাস অস্পষ্ট-- অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বিবর্জিত। তাই এখানে প্রজ্ঞার বিকাশ, বৈদগ্ধের প্রকাশ আদৌ নেই। কিন্তু ছোট প্রাণের ছোট কথাটি নিতান্ত এলোমেলো ভাব সাজানো আছে। চিন্তা ধারার গাঢ়তা নেই-- কিন্তু আছে অনন্ত সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা সমৃদ্ধিই আমাদের ভবিষ্যৎ পথ চলার পাথেয় হোক।

আমরা হৃদয়ের ভাষায় কথা বলতে চেয়েছি। এ বলায় বিদগ্ধ পাঠকের চেতনা আলোড়িত করতে না পারলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তার, বৈদগ্ধের মাপকাঠির পরিবর্তে আন্তরিকতার মাপকাঠিতে এ প্রয়াসের মূল্যায়ন করলে আমাদের প্রতি সুবিচার করা হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের হৃদস্পন্দন ও হৃদয়িক অনুভূতি বাণী লাভ করে এ ভাষাতে। কিন্তু ইংরাজী আন্তর্জাতিক ভাষা। বৃহত্তর জীবনের প্রতিযোগিতায় সফল হতে হলে এবং আমাদের উপলব্ধি বিশ্বজনীন করতে হলে ইংরাজীর মাধ্যমে এগোতে হবে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ হিসেবে এ বার্ষিকীতে যুক্ত হয়েছে ইংরাজী বিভাগ।

সাধ থাকলেও সাধ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য আমাদের অনেকের সাধ পূরণ হয়নি। সীমিত এই কলেবরে সকলের জন্য স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হয়নি। আশা রইল ভবিষ্যৎ তাদের প্রত্যাশাকে সমৃদ্ধি দেবে।

এই বার্ষিকী সকলের সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টার ফসল--ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগের ফলশ্রুতি নয়। এই কর্ম প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে একাগ্রতা ও ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টার প্রয়োজন-- বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সে ডাকে সাড়া দিয়েছে বলেই এর বাস্তবায়ণ-সম্ভব হয়েছে। সকলের মিলিত কর্মোদ্যমই এর উৎসধারা--সকলের আন্তরিকতাই এর লালনক্ষেত্র। সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল।

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ

অধ্যক্ষ কর্নেল জিয়াউদ্দীন আহমদ

সম্পাদনায় ঃ

বাংলা বিভাগ

সুলতান আহমেদ	দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)
সাজেদ আবদুল্লাহ	নবম শ্রেণী (মানবিক)

ইংরেজী বিভাগ

মীর ইমাম হোসেন	দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)
নসরুল হামিদ	দশম শ্রেণী (বিজ্ঞান)

ব্যবস্থাপনায় ঃ

জনাব শাহ মোঃ জহুরুল হক	উপাধ্যক্ষ
জনাব শেখ মোঃ ওমর আলী	প্রবীণ প্রভাষক
মিসেস ডি. আর. ইসলাম	প্রভাষক
জনাব আব্দুর রাজ্জাক	প্রভাষক
শ্রী খগেন্দ্র কুমার সরকার	প্রভাষক (প্রচ্ছদ অঙ্কনে)
শ্রী শীলব্রত চৌধুরী	গ্রন্থাগারিক

সূচীপত্র

বাংলা বিভাগ

কবিতা ঃ

মায়ের স্মৃতি—আব্দুল গাফফার; এটা মোদের স্কুল—মঈন উদ্দিন আহমেদ; দেশ ভ্রমণ—সাইফুর রহমান; আমাদের দেশ—সৈয়দ জামিল আবদাল; হে জননী জন্মভূমি—সুলতান আহমদ; যোজ্যতা—মোঃ মাসুদুর রহমান; ড্যাফোডিল-বীরূপাক্ষ পাল।

ছড়া ঃ

মা থাকলে কাছে—ইমদাদুল হক; ভুড়ির বহর—মেহেবুব হোসেন; মজার ছড়া—সোহেল মাহমুদ; পাখি—কাজী ইমরান; বৃষ্টি নামে—আহমদ গিয়াসউদ্দীন এহসান; ফল কেনা—মাহবুব রহমান; খোকা বলে—মোঃ মোহসীন আলী; গামা হ'বো—মোঃ সদরুল আমীন; ডেন্টিং পেন্টিং—সাদ ওমর; আহ্বান—তোফায়েল আহমদ; নামের ছড়া—সাব্বির সফিউল্লাহ; দাদুর টাক—ওমর ফারুক; বৃষ্টির ছড়া—মোসাদ্দেক আলী মোল্লা; শিম্পু আর টিম্পু—জুবায়ের আলী; ছড়া—মোঃ মঈন আল কাশেম; পেলে—হাবিব আহমেদ; টাকার জোর—জাকিরুল ইসলাম; তিনটি কবিতা—মোঃ শহিদুল ইসলাম।

গল্প ঃ

মৃতু—মামুন আল রশীদ; পদ্মাপাড়ের মাঝি—এস, এল, আবদুল মালেক; তুতুং—প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা;

প্রবন্ধ ঃ

উপ-মহাদেশে মুসলিম কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা—মীর মোঃ ইমাম হোসেন; মহানবীর মানব সেবা—রায়হান ইসহাক আহমদ; আ'মরি বাংলা ভাষা—খালেদ হাসান মাহমুদ; সাহায্য নয় সহযোগিতা—কাজী শাহাদত হোসেন; তাঁবু বাসের মধুর স্মৃতি—মোঃ শরীফ হোসেন খান; বারমুদা ট্র্যাঙ্গেল—হুমায়ুন কবীর; ছত্রাকের কথা—বিকাশ কুমার মজুমদার; মানব জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ—কাজী দীন মোহাম্মদ (খসরু); রোযার তাৎপর্য—সাইফুর রহমান।

ভ্রমণ ঃ

রাজেন্দ্রপুর ও জয়দেবপুর এলাকায় শিক্ষা সফরের প্রতিবেদন—মাহমুদ আলী ফারুক; ঢাকার মিরপুর চিড়িয়াখানায় শিক্ষা সফরের প্রতিবেদন—এম, এ, কাজমী।

কৌতুক ঃ

কৌতুক--এস, এম, তাসিম রেজা ; একটু হাসো--মোঃ সাজ্জাদ হোসেন।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক ঃ

খেলাধূলা--নূর মোহাম্মদ ; ১নং হাউস প্রতিবেদন ; ২নং হাউস প্রতিবেদন ; ৩নং হাউস প্রতিবেদন ; নজরুল ইসলাম হাউস প্রতিবেদন ; ফজলুল হক হাউস প্রতিবেদন ; বিদ্যালয় সংবাদ ; শোক সংবাদ ; অধ্যক্ষের রিপোর্ট।

ENGLISH SECTION

Contents

The Green Valley of life : Golam Samdani ; The Report of the Excursion to Sonargaon on the 15th Oct 1978 : Mustaque Ahmad ; The Baffling Interiors of atoms--the basis af materal creation : Shams Ahmed Zia ; Report on the Educational Excursion to the Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research Laboratories, Dacca : Humayun Kabir ; The Golden Age of Greece : Ashfaque Mansur ; Darkness at Noon : Kamrul Hassan ; Freedom you are : Tr. by Azfar Hossain ; The Report of the Educational Excursion of Savar Dairy Farm : S.M. Shazada Alam ; Telepathy : Sohail Hasnie ; The Sky became Cloudy again--Md. Quamrul Islam ;

Relegion and it's Place in Human Life : A. B. M. Abdul Mannan Miah ; Reaction Speed Test ; Aii Mohammad ; list of Isstructional Staff.

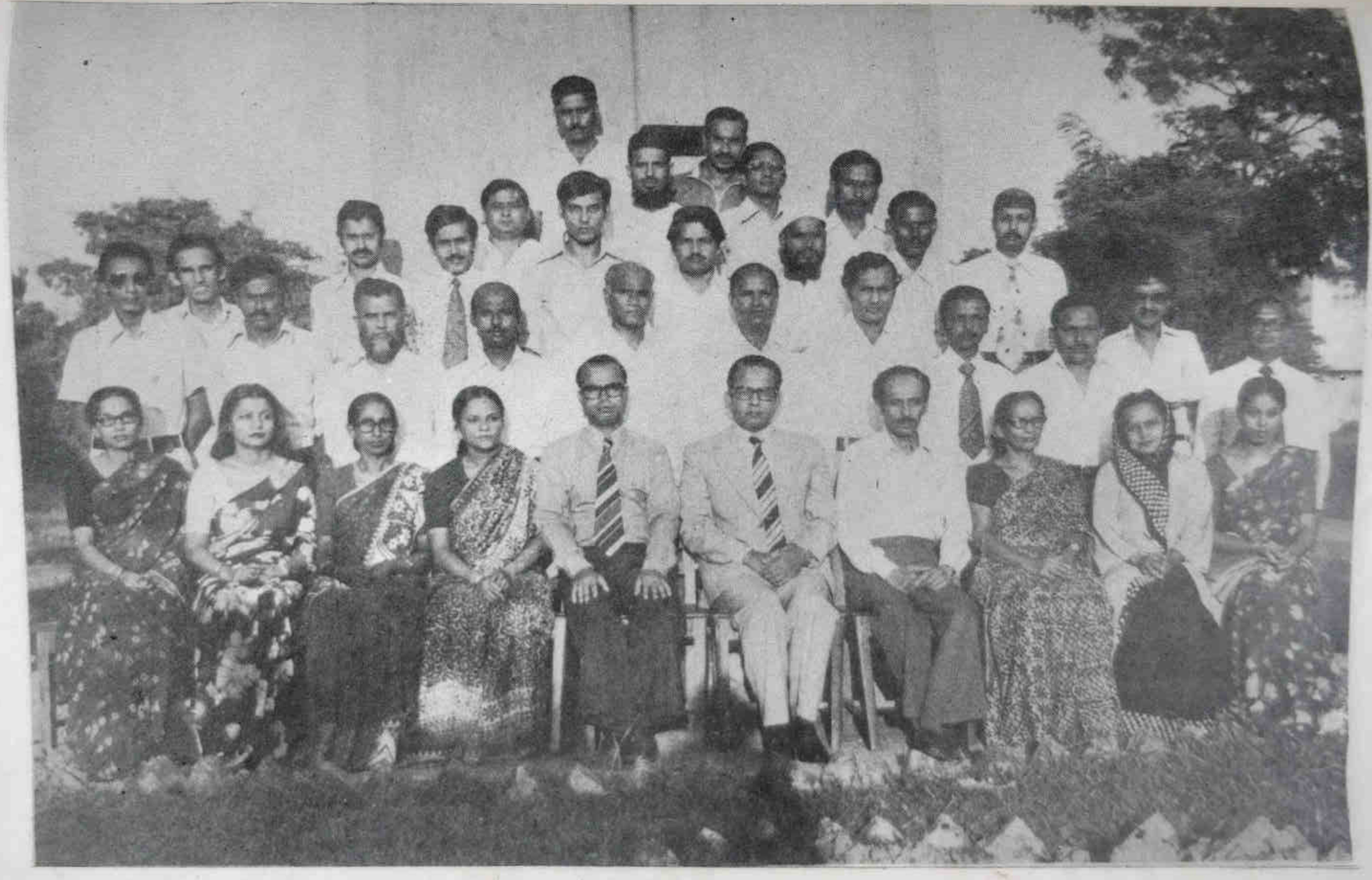

শিক্ষকমণ্ডলী

ম্যাগাজিন কমিটি

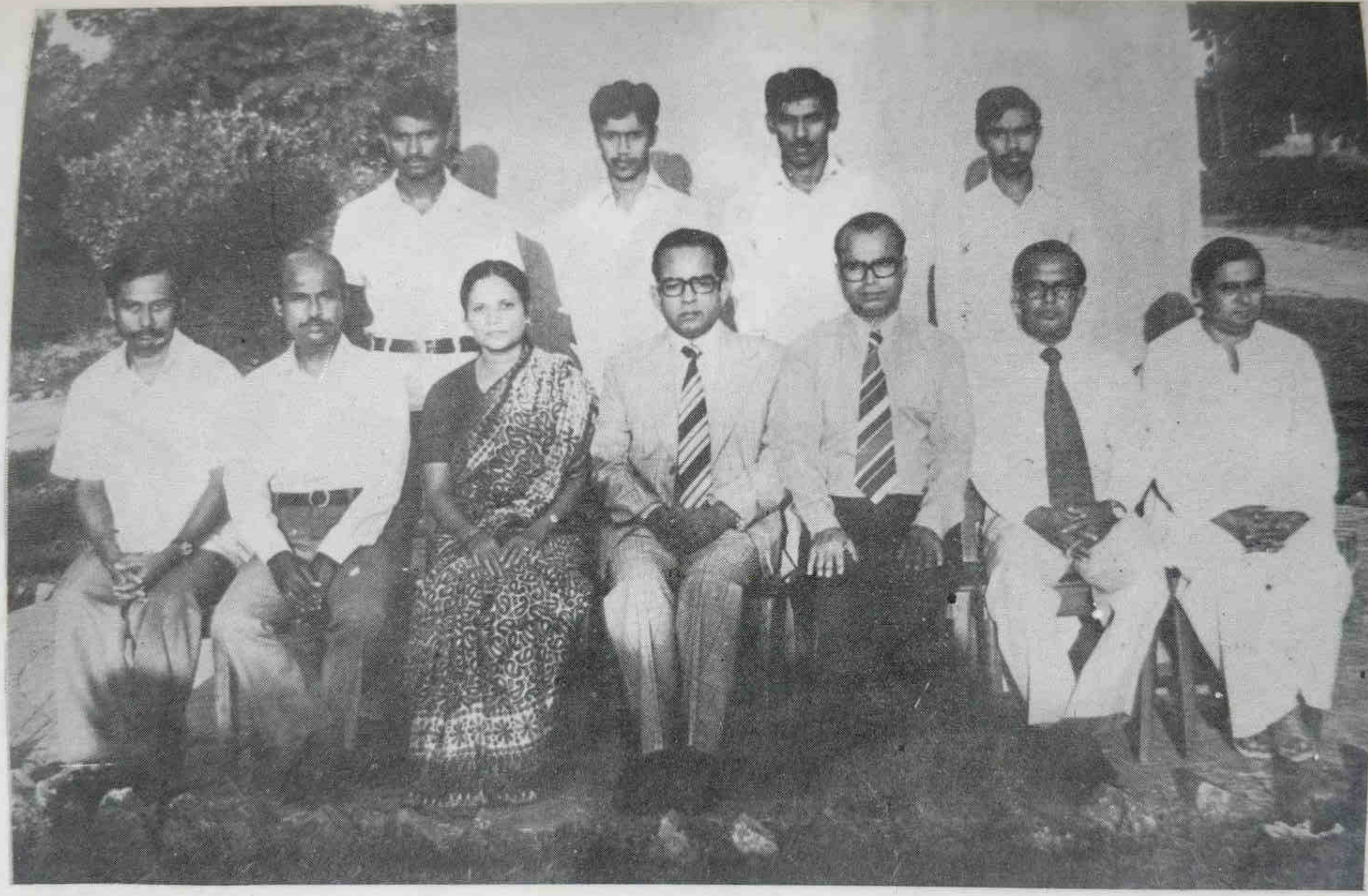

বাম থেকে ডান--উপবিষ্ট ঃ শ্রী শীলব্রত চৌধুরী, শ্রী কে. কে. সরকার, মিসেস ডি. আর ইসলাম, অধ্যক্ষ, কর্নেল জিয়াউদ্দীন আহমদ, উপাধ্যক্ষ, শাহ্ মোহাম্মদ জহুরুল হক, জনাব শেখ মোহাম্মদ ওমর আলী ও জনাব আবদুর রাজ্জাক।

বাম থেকে ডান--দণ্ডায়মান ঃ মাষ্টার মীর ইমাম হোসেন, মাষ্টার সাজেদ আবদুল্লাহ, মাষ্টার নসরুল হামিদ ও মাষ্টার সুলতান আহমেদ।

মায়ের স্মৃতি

আব্দুল গাফফার (লাল)
একাদশ শ্রেণী (মানবিক)
স্কুল নং ১৫০২

মায়ামমতা দিলে যারে আটটি বছর ধরে,
তারে ফেলে কেমন করে চললে পরপারে?
গভীর রাতে দেখি যেন দাঁড়িয়ে আছো ঘরে.
হাসি মাখা হৃদয়খানি আমার হৃদয় ভরে।
ডাকছো যেন এসো খোকন এসো আমার কোলে,
তোমার ডাকে মধুমাখা, হৃদয় আমার দোলে,
মান অভিমান গেলাম ভুলে ধরতে গেলাম তোরে,
শূন্য ঘরে 'মা' 'মা' বলে বৃথা ডাকি জোরে,
স্বপ্নে দেখে তোরে মাগো গভীর রাতে কাঁদি,
বুকের ব্যথা গুমরে মরে গণ্ডে বহে নদী।
মাতৃহারার ব্যথা মাগো কেন এমন বাজে,
তোমার ছবি দেখি কেন আমার সকল কাজে,
হারিয়ে তুমি গেছ মাগো আর পাবনা ফিরে,
স্নেহের তরী বইবে না আর আমার জীবন তীরে।
তবু কেন ঘুরে ফিরে স্মৃতি তোমার ভাসে.
সন্ধ্যা তারা কেন তবু এমন করে হাসে?
তোমার হাসি নিয়ে মাগো চন্দ্র কেন ওঠে,
তোমার সুবাস নিয়ে কেন কুসুম কলি ফোটে?
ঘুমপাড়ানী গানের সুরে অলি কেন গায়?
কোকিল কেন তোমার কণ্ঠ এমন করে পায়?
আকাশ বাতাস তরুলতা যখন যে দিক চাই,
হাসি মাখা মুখখানি তোর দেখতে আমি পাই।
আমার মাঝে আজো, মাগো, তুমি মর নাই,
আমি যেন সারা জীবন তোমার পরশ পাই।

উপমহাদেশে মুসলিম কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা

মীর মোঃ ইমাম হোসেন
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)
স্কুল নং ১৭২৮

"হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হুন-দল পাঠান মোঘল একদেহে হল লীন।"

অতি প্রাচীনকাল থেকে পারসিক, গ্রীক, শক, হুন, তুর্ক-আফগান, মোঘল, ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" এসেছে, কেউবা ফিরে গেছে, আবার কেউবা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে, তারপর একদিন উত্থান পতনের অমোঘ নিয়মে কালের অতল তলে তলিয়ে গেছে। ভাঙ্গাগড়ার সিঁড়ি বেয়েই আরব, তুর্ক-আফগান এবং মোঘলরাও এদেশে এসেছে, স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে, রাজ্য জয় করেছে, রাজত্ব করেছে সুদীর্ঘ ৬৫১ বছর। ৩৩ জন সুলতান (১২০৬-১৫২৬), ১৯ জন মোঘল সম্রাট (১৫২৬-১৫৪০ এবং ১৫৫৬-১৮৫৭), এবং ৪ জন আফগান শাসক (১৫৪০-১৫৫৬) মোট ৫৬ জন মুসলিম শাসক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেছেন। এঁদের কারও শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী কারও বা ক্ষণস্থায়ী। এঁদের প্রত্যেকেরই বিশেষ করে বলবন, আলাউদ্দিন, মুহম্মদ বিন তুঘলক, ফিরোজ শাহ তুঘলক, শেরশাহ, আকবর এবং আওরঙ্গজেবের শাসন ব্যবস্থায় কিছু না কিছু স্বকীয়তা, মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়। তবুও তাঁদের প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় অমিলের চেয়ে মিলই বেশী। তুর্ক-আফগান ও মোঘল শাসকদের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বিশেষ কয়েকটি দিকের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

"আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিক্যাল ঐক্যের কোন লক্ষন কোন কালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্সও তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ নহে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড ঃ ৫৩৮ পৃঃ) অভ্রভেদী হিমাচল ও সাগর বেলা বেষ্টিত ভারতে আপাতদৃষ্টিতে ভৌগোলিক ঐক্য পরিলক্ষিত হলেও "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান" দুর্গম পাহাড়-পর্বত শত-সহস্র নদ-নদী, বিপদসংকুল গভীর অরণ্যানী ইত্যাদি চিরকালই সর্বভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় হয়েছে। মহামতি অশোক, দ্বিতীয় সমুদ্র গুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের মত শক্তিশালী শাসকের আমলেও আসমুদ্র হিমাচল এক শাসনাধীনে আসেনি। আলাউদ্দিন খিলজীই সর্বপ্রথম হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ জয় করে রাজনৈতিক ঐক্যের সূচনা করেন। মোঘল যুগে শুধু রাজনৈতিক ঐক্যই নয় সর্বভারতীয় ঐক্যও স্থাপিত হয়েছে। পূর্বে আসাম থেকে

পশ্চিমে কাবুল এবং উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল মোঘল সাম্রাজ্য। ডঃ এম, এল, রায় চৌধুরী বলেন, "এক সম্রাট, এক রাষ্ট্র, এক শাসন, এক বিধান, এক রাষ্ট্রভাষা, এক মুদ্রা এবং এক মিলিত সংস্কৃতি ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সূচনা করিত।"

ইসলামের দৃষ্টিতে সুলতান বা সম্রাট ছিলেন আমিরুল মুমেনীন অর্থাৎ কেবল মুসলমানদের শাসক বা নেতা। দামেস্ক ও বাগদাদের খলিফারাই সত্যিকারের আমিরুল মুমেনীন ছিলেন, কারন তারা শরীয়ত মোতাবেক শাসন কার্য পরিচালনা করতেন কিন্তু এই উপমহাদেশে সুলতান বা সম্রাটরা কেবল মুসলমানদের শাসক এবং ধর্মীয় নেতা ছিলেন না, অমুসলমানদেরও শাসক ছিলেন। কাজেই তাঁরা ইসলামের বিধি বিধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান প্রজাদের ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রথা অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। মুসলিম শাসন ব্যবস্থা ছিল ইসলামিক বিধি-বিধান ও অমুসলমানদের প্রথার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। কাজেই মুসলিম শাসন ব্যবস্থা ধর্ম ভিত্তিক হলেও পুরোপুরি ঐসলামিক ছিল না।

রাষ্ট্র পরিচালনায় উলেমাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম। উলেমারা ধর্মীয় আইনের যে ব্যাখ্যা দিতেন সুলতানকে তা মেনে নিতে হতো। আলাউদ্দিন ও মুহম্মদ বিন তুঘলক ব্যতীত অন্য কোন সুলতান উলেমাদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হননি। কারণ ধর্মান্ধতার যুগে উলেমাদের সঙ্গে বিরোধের অর্থ ছিল শাসকের পতন। উলেমাদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়ে মুহম্মদ বিন তুঘলক নিজের পতন ত্বরান্বিত করেন। আগা মেহেদী হোসেন বলেন, "He (Mohammad-bin-Tughla q) roused the opposition of the Ulama, and in his attempt to reform them not only paralysed the right arm of the state, but raked up hostilities before which he succumbed and his imperialism perished."

আলাউদ্দিনই সর্ব প্রথম সফলতার সাথে উলেমার পরামর্শ উপেক্ষা করে স্বীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতের বাইরে "ইসলামের সুযোগ্য রক্ষক" হিসেবে পরিচিত হলেও উলেমাদের পরামর্শ রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণের পরিপন্থী হলে তিনি তা অনায়াসে, নিঃসংকোচে উপেক্ষা করতেন। একবার তিনি আলাউল মূল্‌কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন—"মানুষ অমনযোগী, অশিষ্ট এবং আমার আদেশ অমান্য করে। এই অবস্থায় তাদের বশ্যতা স্বীকার বাধ্য করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করি। এটা আইন সঙ্গত কি বেআইনী আমি তা জানিনে। রাষ্ট্রের জন্য যা মঙ্গল ও জরুরী অবস্থার উপযোগী তা করার জন্য আদেশ দিই।" আলাউদ্দিন ধর্মাধর্ম বিচার না করে প্রজা ও রাজ্যের মঙ্গলের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে জিয়াউদ্দিন বারানী বলেন, "His only care was the welfare of his kingdom. No consideration for religion, no regard for the ties of brotherhood or the filial relation, no care for the rights of others, ever troubled him (Alauddin)।" অন্যান্য সুলতানদের মত আলাউদ্দিনের ইসলাম প্রীতির পরিচয় খুব বেশী পাওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে তাঁকে উপমহাদেশের নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থার পথিকৃৎ বলা যায়।

মোঘল আমলে উলেমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস পায়। তাঁরা ধর্মীয় আইনের ব্যাখ্যা দিতেন, সম্রাটকে শাসন কার্যে পরামর্শ দিতেন। তাঁদের মতামত গ্রহন করা না করা সম্রাটের মর্জি। বাবর ও হুমায়ূন ইসলামের নীতি অনুসরণ করলেও, তাঁরা পরধর্ম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছেন। শেরশাহের ধর্মনীতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত বিরোধ থাকলেও, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল প্রজার মঙ্গল সাধনাই ছিল শেরশাহের পরম আদর্শ। পরমধর্ম সহিষ্ণুতায় সর্বকালের সর্বদেশের শাসকদের মধ্যে আকবরই সর্বোত্তম। ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতির এমন অপূর্ব সমন্বয় সাধন মানব সভ্যতার ইতিহাসে নজির বিহীন। "প্রেম পদার্থটি ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে, আকবর সকল ধর্মের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয় মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত, নিষ্ঠার সহিত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পারসিক ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীদিগকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রীসভায়, হিন্দু বীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে, প্রেমের দ্বারা, সমস্ত ভারতবর্ষকে রাজা-প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন।" (রবীন্দ্র রচনাবলী দশম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৯১-৩৯২)।

আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে সর্বভারতীয় ঐক্য এবং মোঘল সাম্রাজ্যের সংহতি সাধন এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে মহামতি সম্রাট সকল ধর্মের সার বস্তু নিয়ে দীন-ই-এলাহী নামে একটি মতবাদ প্রচার করেন। প্রকৃত পক্ষে দীন-ই-এলাহী ছিল ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আকবরের পরিপক্ক অভিজ্ঞতা ও সুদীর্ঘ সময়ের গভীর চিন্তাধারার ফসল। তাঁর মৃত্যুতেই দীন-ই-এলাহীর মৃত্যু হয়নি। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান এর মর্মবাণী অনুসরণ করেছেন। আলমগীর ব্যতিক্রমধর্মী ও বিতর্কিত সম্রাট। মুসলমানদের দৃষ্টিতে আলমগীর ছিলেন জিন্দাপীর, অমুসলমানদের দৃষ্টিতে পরধর্ম অসহিষ্ণু গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। এ কথা সত্য যে আলমগীর তাঁর পূর্বপুরুষদের সমন্বয়ী শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে ঐসলামিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ফলে তাঁর শাসননীতিতে ত্রুটি না থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানেরা তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে অনুদার আখ্যায়িত করে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছে। যাহোক, আলমগীরের আমলে, সমন্বয়ী ধারা স্তব্ধ হয়েছে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রবর্তিত ঐসলামিক ধারাও থেমে গেছে। ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসকদের মতবাদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসিতের মনোভাবের যে সংঘাত দেখা দিয়েছিলো, সেই সংঘাতই পরবর্তী কালে উপমহাদেশের ইতি-হাসের গতিধারা নিয়ন্ত্রিত করেছে। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে আকবরের সমন্বয়ী ধারা কিংবা আলমগীরের ঐসলামিক ধারা প্রবহমান থাকলে আমাদের ইতিহাস অন্য রকম হতে পারতো।

মুসলিম শাসকদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন বলবনই সর্ব প্রথম রাজপদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হন। বলবন বিশ্বাস করতেন যে সুলতান সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক। সুলতান আল্লাহর ছায়া মাত্র। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ সুলতানের উপর ছায়া সম্পাত করে। তাঁর

বিশ্বাস ছিল যে প্রজার ভীতিই রাজশক্তির ভিত্তি। অষ্ট প্রহর ভীমদর্শন প্রহরী বেষ্টিত বলবন নিদ্রার সময় ব্যতীত সর্বক্ষণ সৈনিকের পরিচ্ছদে ভূষিত থাকতেন। তার দর্শন লাভ সাধারণ প্রজা ও নিম্নশ্রেণীর আমীরের পক্ষে ছিল এক দুর্লভ সৌভাগ্য। পারস্যের দরবারের অনুকরণে তাঁর দরবার ছিল সুসজ্জিত। মধ্য এশিয়ার সেলজুক দরবারের রীতিনীতি তাঁর দরবারে প্রবর্তিত হয়। রাজপদের মর্যাদা সম্পর্কে বলবনের ধ্যান-ধারণাই ছিল পরবর্তী কালের শাসকদের ধ্যান-ধারণা। আলাউদ্দিন বলবনের মত সুলতানকে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগৃহীত মানব বলে মনে করতেন। মহামতি আকবর বিশ্বাস করতেন যে শাসক অন্যান্য ব্যক্তিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্‌র ছায়া ও প্রতিনিধি। আবুল ফজল বলেন, "Royalty is a light enaminating from god, a ray from the sun, the illuminator of the universe, an argument of the book of perfection, receptacle of all virtues."

মুসলিম শাসন ব্যবস্থা ছিল স্বৈরতন্ত্র। রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা শাসকের হাতে কুক্ষিগত ছিল। রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন একাধারে প্রধান আইন প্রণেতা, প্রধান বিচারক। প্রধান সেনানায়ক এবং প্রধান শাসক। বিদ্রোহের ভীতি এবং প্রচলিত প্রথা ব্যতীত শাসকের সীমাহীন ক্ষমতাকে বাধা দেওয়ার মত শক্তি কারও ছিল না। অবশ্য ইসলামের নীতি লংঘণ করলে উলেমাদের ফতোয়া দ্বারা শাসককে অপসারণ করার নিয়ম ছিল। কিন্তু সামরিক শক্তিতে বলীয়ান শাসককে ফতোয়া দ্বারা সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে এমন নজির নেই।

অবশ্য শাসন ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্র হলেও স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিল না। শাসকের ক্ষমতা ছিল যেমন অপ্রতিহত, দ্বায়িত্বও ছিল তেমনি অপরিসীম। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ, রাজ্য বিজয়, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, প্রজাদের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ, জ্ঞানী গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা, জনহিতকর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি শাসকের প্রধানতম কর্তব্য ও দ্বায়িত্ব বলে বিবেচিত হ'ত। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং প্রজাদের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রেখেই শাসন কার্য পরিচালিত হত। ফিরোজ শাহ তুঘলকের কর্ম সংস্থান ও বিবাহ বিভাগ, দান বিভাগ, সেচ ব্যবস্থা, খাল ও কূপ খনন, নগর পত্তন, রাস্তা নির্মাণ, চিকিৎসালয় স্থাপন, বিদ্যোৎসাহিতা, জ্ঞানীর পৃষ্ঠপোষকতা, নিষ্ঠুর শাস্তি বিধান বর্জন, সর্বোপরি অদম্য প্রজামঙ্গলাকাঙ্খা নিঃসন্দেহে সুলতানী আমলের গৌরবময় অধ্যায়। প্রজাদের মঙ্গল ও সমর্থন ছিল শেরশাহের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি। আকবর ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্রাট। সুমহান আদর্শ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সফলতার জন্য তিনি জাতীয় সম্রাটের মর্যাদা লাভ করেছেন। কানুনগোর মতে জাতীয় একতা বিধান করার মহান ধারণার জন্য তিনি ভারতীয় শাসকদের মধ্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী। ম্যালসনের মতে আকবরের অনুসৃত নীতিগুলো শাসক ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সকল অনুশাসন অপেক্ষা উত্তম ছিল।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম কর্তৃক বিজিত দেশ খলিফার নিয়ন্ত্রনাধীন। এই নিয়ম অনুযায়ই সুলতানেরা খলিফার কর্তৃত্ব ও মর্যাদার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করতেন এবং খলিফার কাছ থেকে সনদ, খেতাব ও উপাধি লাভ করতেন। ইলতুৎমিসই সর্বপ্রথম বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে ধর্ম সম্মত সুলতান রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন, গিয়াসউদ্দিন বলবনও এই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। আলাউদ্দিন কোন খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতি বা উপাধী চাননি।

তিনি স্বয়ং "ইয়্যাসমিন-উ-খিলাফাত" (খলিফার দক্ষিণ হস্ত) উপাধী গ্রহণ করেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক মিশরের আব্বাসীয় খলিফাকে ইসলামের অধিনায়ক বলে স্বীকার করেন। এবং তাঁর কাছ থেকে উপাধী ও তরবারি লাভ করেন। খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করলেও দিল্লীর সুলতানেরা ছিলেন শাসন ব্যাপারে স্বাধীন ও সার্বভৌম। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁরা খলিফার কাছ থেকে কোন পরামর্শ বা আদেশ চাননি বা পাননি। কিন্তু কোন মোঘল সম্রাট কোন খলিফার কাছ থেকে কোন সনদ বা স্বীকৃতি লাভের প্রয়োজন বোধ করেননি।

দামেস্ক ও বাগদাদের খলিফাদের ন্যায় উপমহাদেশের মুসলিম শাসকরাও সার্বভৌম রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতার উৎস ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রাজকর্মচারীর সহায়তায় এবং উলেমা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত রাজকর্মচারী, সেনানায়ক এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি ও উলেমারা তাঁকে পরামর্শ দিতেন। তিনি তাদের পরামর্শ শ্রবণ করতেন। কিন্তু পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলেন না। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সুলতান বা সম্রাটের মতামতই ছিল চূড়ান্ত।

কোন দেশের শাসন ব্যবস্থা একদিনে গড়ে উঠে না। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে একটি দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠে। এদেশে মুসলিম শাসন ব্যবস্থাও এভাবে ধীরে ধীরে রূপ লাভ করেছিল। উল্লেখ্য যে, কতুবউদ্দিন তথা দিল্লীর সুলতানদের সম্মুখে মুসলিম শাসনের কোন নজির ছিল না। কোরান, সুনাহ ও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানদের ন্যায়শাস্ত্র, প্রথা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে তাঁরা যুগোপযোগী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। এদিক থেকে মোঘল শাসকগণ ভাগ্যবান, কারণ তাঁদের সম্মুখে ৩২০ বৎসরের দিল্লী সালতানাতের শাসন ব্যবস্থা নজির হিসেবে ছিল। ৩২০ বছরে (১২০৬-১৫২৬) পাঁচটি রাজবংশের পতন, আমীর ওমরাহদের দ্বন্দ্ব-কলহ, স্বার্থ সংঘর্ষ হেরেমে ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি, প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ, অমুসলমান রাজন্যবর্গের বিরোধীতা, সর্বজনগ্রাহ্য শাসনতান্ত্রিক গঠনের জটিলতা ইত্যাদি মোঘল শাসনতান্ত্রিক সংগঠনে শ্রেষ্ঠ দিশারী হিসেবে কাজ করেছে।

সম্রাট বা সুলতান প্রজাদের দর্শন দিতেন, তাদের অভিযোগ শ্রবণ করতেন এবং নিজে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করতেন। তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ আপীল আদালত। বিচার ব্যবস্থায় সুলতান বা সম্রাটের পরেই ছিলেন কাজী উল কুফাৎ বা প্রধান কাজী। মুফতীরা ইসলামিক আইনের ব্যাখ্যা করতেন। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে মৃত্যুদণ্ড ও অঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। বিচার ব্যবস্থা ও দণ্ডবিধি ঐসলামিক হওয়া সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে অমুসলমানদের পঞ্চায়েত প্রথা বহাল ছিল এবং তাদের বিবাহ, সম্পত্তি বন্টন, জাতিভেদ ইত্যাদি ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত শাস্ত্র অনুসরণ করা হ'ত। মুসলিম শাসকদের অনেকেরই বিচারে ন্যায়নিষ্ঠা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে।

সুলতানী আমলে প্রধানমন্ত্রী বা ওয়াজীর ছিলেন সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত রাজকর্মচারী। তিনি যে সমস্ত প্রশাসনিক বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল--রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ, আপীল বিভাগ, সামরিক বিভাগ, কৃষি বিভাগ, যোগাযোগ বা চিঠি পত্রাদি বিভাগ, গুপ্তচর বিভাগ, ডাক বিভাগ, ক্রীতদাস বিভাগ, খাজনা আদায় বিভাগ, দান বিভাগ, ভাতা বিভাগ, টাকশাল বিভাগ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিভাগের একজন প্রধান থাকতেন। প্রধানমন্ত্রীর কাজে সহায়তা করার জন্য একজন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্মচারী

থাকতেন। উল্লেখ্য যে, প্রশাসনিক বিভাগগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুলতান সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ঋণ আদায় বিভাগ, কৃষি বিভাগ ও দান বিভাগ যথাক্রমে আলা-উদ্দিন, মুহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরোজ শাহ কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে।

শেরশাহ চারজন প্রধান ওয়াজীর বা মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন--(১) রাজস্ব মন্ত্রী (২) সৈন্যবিভাগীয় মন্ত্রী (৩) পররাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী ও (৪) লিখন ও দলিল বিভাগীয় মন্ত্রী। তাছাড়া বিচার, ডাক ও রাজ প্রাসাদের জন্য মন্ত্রী ছিল। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে প্রধান মন্ত্রীর উপাধী ছিল উকিল। কখনও কখনও তাঁকে ওয়াজির বা ওয়াজিরই-আলা বলা হ'ত। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেসামরিক অফিসার। কদাচিৎ সামরিক অভিযানের দ্বায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল রাজকার্য সম্পর্কে সম্রাটকে পরামর্শ দান করা। প্রধানতঃ রাজস্ব বিভাগের দ্বায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকত। বাবর থেকে আকবরের আমল পর্যন্ত প্রশাসনিক বিভাগ ছিল চারটি। আলমগীরের আমলে এই সংখ্যা ছিল ছয়। বিভাগগুলো ছিল ঃ (১) দিওয়ানের অধীনে রাজস্ব বিভাগ (২) মীর বখসীর অধীনে সামরিক বেতন ও হিসাব রক্ষণ বিভাগ (৩) প্রধান কাজীর অধীনে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার বিভাগ (৪) প্রধান সদরের অধীনে দাতব্য বিভাগ (৫) খান-ই-সামানের অধীনে রাজ-প্রাসাদের তত্ত্বাবধান বিভাগ (৬) মুহতুমিরের অধীনে নৈতিকতা বিভাগ। তাছাড়া গুপ্তচর ও ডাক বিভাগও ছিল।

সংক্ষেপে বলা যায়, আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনায়কের মতো উপমহাদেশের মধ্যযুগের মুসলিম শাসকরাও প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী ও বিভিন্ন স্তরের রাজকর্মচারীর সাহায্যে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি ও উলেমাদের পরামর্শক্রমে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। তখনকার দিনে জীবন যাত্রার আধুনিক যুগের জটিলতা ছিল না বলে প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যাও ছিল কম।

সুলতানী আমলে সৈন্য বাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল--সুলতানের সরাসরি নিয়ন্ত্রনাধীন সৈন্যবাহিনী এবং প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন সৈন্যবাহিনী। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রাদেশিক শাসন কর্তারা সুলতানকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকতেন। অনেক সময় তাঁরা সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করতেন এবং প্রয়োজনের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক দক্ষ সৈন্য সরবরাহ করতে পারতেন না। আলাউদ্দিনই সর্বপ্রথম সৈন্য বাহিনীর পুনর্গঠনে মৌলিকতার পরিচয় দেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্য তিনি অশ্বচিহ্নিতকরণ ও নির্ভুল তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন। শেরশাহ ও মহামতি আকবর সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনে আলাউদ্দিনকে অনুসরণ করেন। অবশ্য আকবর আলাউদ্দিন অপেক্ষা অনেক বেশী মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আকবর মনসবদারী প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে সৈন্যবাহিনীকে অধিকতর সুশৃঙ্খল করেন। "মনসব" শব্দের অর্থ হচ্ছে, পদমর্যাদা বা অফিস, এ পদমর্যাদার অধিকারীকে মনসবদার বলা হ'ত। প্রত্যেক মনসবদারকেই নিজ ব্যয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য প্রতিপালন করতে হ'ত। দশ থেকে দশ সহস্র অশ্বারোহী (সওয়ার) এবং পদাতিক (জাট) সৈন্য নিয়ে "মনসব" পদ গঠিত হ'ত। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সৈন্যাধক্ষদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর প্রদান করা হ'ত। এ ব্যবস্থায় রাজকোষে বিশেষ অর্থাগাম হ'ত না। তাছাড়া সৈন্যবাহিনী প্রতিপালনে তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিতেন। এই কারণে আকবর জায়গীর প্রথা বিলোপ করে মনসবদারী প্রথার প্রবর্তন

করেন। প্রত্যেক মনসবদারকে তাঁর পদমর্যাদা এবং তার অধীনস্থ সৈন্য সংখ্যা অনুযায়ী রাজকোষ থেকে বেতন দেওয়া হ'ত।

সুলতানী আমলে সৈন্যবাহিনীর তিনটি শাখা ছিল (ক) পদাতিক (খ) অশ্বারোহী (গ) হস্তীবাহিনী। মোঘলদের সৈন্যবাহিনীতে আরো দু'টি শাখা বেশী ছিল (ক) গোলন্দাজ বাহিনী ও (খ) নৌ-বাহিনী। সৈন্যবাহিনীতে তুর্কী, আফগান, পারসিক, মোঘল ও ভারতীয়রা স্থান লাভ করে।

মুসলিম শাসন ব্যবস্থা সামরিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, রাজ্য জয়, শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারে সামরিক শক্তি ছিল অপরিহার্য। সুলতানী আমলে তো বটেই, এমন কি মোঘল আমলেও (জাহাঙ্গীরের সময় থেকে) সিংহাসনের দাবীদারের উপযুক্ততা যাচাই হ'ত তার সামরিক শক্তি দিয়ে। যারা দীর্ঘকালে রাজত্ব করেছেন এবং শাসক ও বিজেতা হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েছেন, তাঁরা সকলেই সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। সে যুগে উলেমাদের পরামর্শ উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল, কিন্তু সামরিক শক্তিকে উপেক্ষা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। সামরিক শক্তির দুর্বলতার অর্থই ছিল বৈদেশিক আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ এবং পরিণামে শাসকের পতন, এমন কি রাজবংশের পরিবর্তন। উদাহরণ স্বরূপ সুলতানী আমলের পাঁচটি রাজবংশের পতনের কথা উল্লেখ করা যায়। পক্ষান্তরে, সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বলবন কেবল রাজকীয় মর্যাদাই প্রতিষ্ঠা করেননি, মুসলিম শাসন ব্যবস্থা সুসংহত ও সুদৃঢ়ও করেছিলেন। বিরাট সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে আলাউদ্দিন ছয়বার মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন, চারটি আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন এবং সমগ্র ভারত জয় করেন। মোঙ্গল ভীতি দূর হওয়ার পর বিরাট সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন যে সৈন্যবাহিনী অলস ভাবে বসে থাকলে শুধু অকর্মণ্য হয়ে পড়বে না, বিদ্রোহও করতে পারে। তাই তিনি দাক্ষিণাত্যকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়ে সৈন্যবাহিনীকে নিয়োজিত করেন। তাছাড়া সৈন্যবাহিনীর ভরণ-পোষণের খরচ যোগানোর উদ্দেশ্য দাক্ষিণাত্যকে কামধেনুরূপে ব্যবহার করেন। মুহম্মদ-বিন-তুঘলক খোরাসান বিজয়ের জন্য ৩,৩৭০০০ সৈন্য এক বছরে সংগ্রহ করেছিলেন। পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরাসান অভিযান পরিত্যাক্ত হয় এবং সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হয়। এই বেকার সৈন্যরাই পরবর্তী সময়ে দোয়াব অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আকবর বলেন, "রাজা রাজ্য জয় করবেন এ নীতি স্বাভাবিক। তা না হলে প্রতিবেশী রাজা তাঁর বিরোধিতা করবেন। সৈন্যরা যুদ্ধ না করলে অভ্যাসের অভাবে তাদের যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শিতা নষ্ট হয়ে যাবে, সৈন্যবাহিনী বিশৃঙ্খল হবে।" এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আকবর সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে নিয়োজিত করেন।

সুলতানী আমলে প্রধান মন্ত্রী, শেরশাহের আমলে দেওয়ান-ই ওজারাত (রাজস্বমন্ত্রী) এবং আকবরের আমলে দিওয়ান রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দিল্লীর সুলতানরা প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেননি। এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট হিসাবের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি। আলাউদ্দিন, মুহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরোজ শাহের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বহলুল লোদীর উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সংস্কারগুলো তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মুসলিম ভারতে আয়-ব্যয়ের হিসাব ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ করার সর্বপ্রথম ব্যবস্থা করেন সেকেন্দার লোদী। বাবর ও হুমায়ূন সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ করেন। শেরশাহই সর্বপ্রথম মুসলিম ভারতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেন। সত্যি কথা বলতে কি, রাজস্ব ব্যবস্থাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। মহামতি আকবর শেরশাহের অনুসরণেই যুগোপযোগী অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করেন।

কেন্দ্রীয় রাজকোষের আয়ের প্রধান উৎস (ক) ভূমিরাজস্ব (খ) গনিমাহ বা লুন্ঠিত দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ, (গ) জাকাত এবং (ঘ) জিজিয়া। তাছাড়া জলকর, পথকর, চারণ ভূমিকর, গৃহকর, তীর্থকর, উপঢৌকন ইত্যাদিও আয়ের উৎস ছিল।

ভূমি রাজস্ব ঃ ভূমিকর রাজকোষের প্রধানতম উৎস ছিল। মুসলিম ভারতে উৎপাদিত শস্যের এক তৃতীয়াংশ ভূমিরাজস্ব রূপে আদায় করা হ'ত। কেবল আলাউদ্দিনের আমলেই ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল উৎপাদিত শস্যের অর্ধাংশ। প্রজা ইচ্ছানুযায়ী নগদ অর্থ বা শস্যাংশ রাজস্ব রূপে প্রদান করত। ভূমি রাজস্ব নির্ধারণে শেরশাহই সর্বপ্রথম ন্যায় ভিত্তিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তিনি মুলতান ও রাজস্থান ব্যতীত সাম্রাজ্যের সমস্ত আবাদযোগ্য জমির জরিপ করান এবং জমির উর্বরতা অনুযায়ী জমিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁর ভূমিরাজস্বের তিনটি শ্রেণী ছিল– (ক) বাটাই অর্থাৎ উৎপাদিত শস্যের যথার্থ বন্টন, যেমন বর্তমান ভাগ চাষী ব্যবস্থা (খ) মুক্তাই অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের আনুমানিক পরিমাণ অনুযায়ী বন্টন (গ) জমাই অর্থাৎ তিন বৎসরের জন্য নগদ জমা কর নির্ধারণ। শেরশাহের প্রবর্তিত পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রথা রাজকর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতাকে হ্রাস করে এবং প্রজার ভূমি স্বত্ব স্থির করে। ভূমিরাজস্ব নির্ধারণে উদারতা, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা এবং শস্য হানির সময় কর মওকুফ ছিল শেরশাহের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মূলনীতি। আকবর শেরশাহকে অনুসরণ করে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আরো উন্নতি সাধন করেন। ১৫৮০ সালের আইন-ই-দশসালা অর্ডিন্যান্স বলে যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তা টোডরমলের বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এই বন্দোবস্তের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল--(১) দড়ির পরিবর্তে জরিব নামক লোহার বলয় দ্বারা বেষ্টিত শক্ত দণ্ডের সাহায্যে প্রতিটি কৃষকের আবাদী জমির জরিপ করা হ'ত। (২) একটানা কত সময় চাষ করা যায় তারই ভিত্তিতে চাষযোগ্য জমিকে চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়--(ক) পোলাজ অর্থাৎ যে জমি সারা বছর চাষ উপযোগী, (খ) পারাউতি/পড়তি অর্থাৎ যে জমির উর্বরতা রক্ষার জন্য আবাদের পর কিছুকাল পতিত রাখা হয়। (গ) চাচর অর্থাৎ যে জমি একবার আবাদের পর ৩/৪ বছর পতিত থাকে, (ঘ) বনজর অর্থাৎ যে জমি পাঁচ বছর বা তার বেশী পতিত থাকে। (৩) প্রতি পরগণায় প্রত্যেক প্রজার জমিতে বিগত দশবছরে উৎপাদিত প্রতি প্রকার ফসলের গড় পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ভূমিরাজস্ব (⅓) নির্ধারিত হ'ত। এ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা উত্তম হলেও আলমগীরের সময় থেকে তার অবসান ঘটতে থাকে।

গনিমাহ ঃ যুদ্ধ চলাকালে লুন্ঠিত দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ রাজকোষে জমা রেখে বাকী অংশ মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হতো। রাষ্ট্রের জন্যে রক্ষিত এক পঞ্চমাংশকে খুম্‌স বা গনিমাহ বলা হয়। জাকাত ঃ ঐসলামিক নিয়ম অনুযায়ী মুসলমানদের কাছ থেকে শতকরা আড়াই ভাগ হারে এই কর আদায় করা হ'ত।

জিজিয়া ঃ জানমালের নিরাপত্তার বিনিময়ে এবং সৈন্য বাহিনীতে যোগদান থেকে অব্যাহতি লাভের বিনিময়ে অমুসলমানরা জিজিয়া কর প্রদান করত। মহামতি আকবর জিজিয়া কর রহিত করেন। কিন্তু আলমগীর তা পুনরায় আরোপ করেন। অবশ্য তাঁর সৈন্যবাহিনীর কর্মরত অমুসলমানদের এই কর দিতে হ'ত না। যাহোক, জিজিয়া কর মুসলিম শাসক ও অমুসলমান শাসিতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠার পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। অমুসলমানরা এই করকে ঘৃণার চোখে দেখত; এই কর দিতে হ'ত বলে তারা নিজেদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে মনে করত।

তুর্ক আফগান ও মোঘলরা এদেশে এসেছে, রাজ্য জয় করেছে, শাসন করেছে এটুকু বললেই সব বলা হলো না। তাঁরা ইংরেজদের মত বিদেশী শাসক ছিলো না। এদেশের সম্পদ লুন্ঠন করে ইংরেজদের মত স্বদেশে প্রেরণ করেননি। মুসলমান হলেও তাঁরা ভারতে বাহুবলে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করেননি। বাগদাদ ও মিশরের খলিফা, তুর্কীর সুলতান ও পারস্যের বাদশাহকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেছেন। তাঁরা আশৈশব ধাত্রী মাতৃভুমি মধ্য এশিয়া, তুর্কী, পারস্যে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখেননি। বরং তাঁরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন, এদেশকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসিতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই বাস করেছেন। তাঁরা এদেশের স্থাপত্য, শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ইত্যাদিতে নতুন জীবনের স্পন্দন এনেছেন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যতটা ছাপ রেখে গেছেন অন্য কোন জাতি ততটা পারেনি। উপমহাদেশের বর্তমান সামগ্রিক জীবন ধারায় জাতিগুলোর অবদান সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। বলতে গেলে, বর্তমান জীবন ধারা তুর্ক আফগান আর মোঘল আমলের জীবনধারার চলমানতা (Continuity)। তাই কবি বলেছেন,

"তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর
আমার শোনিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।"

●

"ত্যাগ ছাড়া শক্তি, সততা ছাড়া কর্মদক্ষতা, শৃঙ্খলা ছাড়া স্বাধীনতা কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নয়।" —সমারসেট মম

এটা মোদের স্কুল

মঈন উদ্দিন আহমেদ
সপ্তম শ্রেণী
স্কুল নং ২৪২৬

এটা মোদের স্কুল
নাই তাতে কোন ভুল।
শৃঙ্খলার শিকলে
বাঁধা আছি সকলে।
সবে ভোর পাঁচটা
বাজে ঘন ঘন্টা
সারি বাঁধি মাঠেতে
মর্নিং পি, টি-তে
যোগ দিই সকলে
যায় প্রাণ ধকলে।
বেশ ভূষা বদলে
ব্রেকফাস্ট টেবিলে
জ্যাম জেলি ব্রেড বাটার
দুধ খাও চমৎকার
করি তাদের সৎকার।
দৌড় দিই তার পর
সোজা যাই স্কুল
এর কোন নাই ভুল।
সবে পৌণে আটটা
পড়ে গেল ঘন্টা
শুরু হলো পাঠদান
খুলে গেল চোখ কান।
বাজে সাড়ে দশটা
টিফিনের কাজটা
সেরে নাও এখনি,
খেতে হবে বকুনি,

হয় যদি কোন ভুল
এটা মোদের স্কুল
নাই তাতে কোন ভুল।
শৃঙ্খল শিকলে
বাঁধা আছি সকলে
বই খাতা বগলে
ফিরে এলো সকলে।
একটার পরেতে
ডাইনিং ঘরেতে
ডাল ভাত গোস্‌তো
লানচ্‌ খেয়ে সুস্থ
রেস্ট অতি অল্প
গাল ভরা গল্প
কিছুক্ষণ চললো
কে যেন বললো
শুরু হলো কাজ কাম
ভুলে যাই নিজ নাম
নিয়মের নাই ভুল
এটা মোদের স্কুল।
বৈকালে চা পান,
বিস্কিট দু'টি খান
হকি খেলা ফুটবল
বাস্কেট ভলিবল
যার যা মন চায়
প্রাণ ভরে খেলা যায়

মাত্র এক ঘন্টা
ভরে নাকো মনটা।
শাওয়ারের পানিরে
খুব বেশী নাইরে।
দেরি হয়ে যায়রে,
দুধটুকু খেয়ে নাও,
যার যার ঘরে যাও।
হোম ওয়ার্ক খাতাটা
খেয়ে ফেলে মাথাটা।
সবদিন পরীক্ষা
কর কিছু শিক্ষা।
ডিনারের ঘন্টা,
নেচে ওঠে মনটা।
চিকেনের ঠ্যাংটা,
মাটনের হাড়টা,
সবে শুধু ধরেছি
যেই ভাবি ভুলেছি

আজকের পড়াটা,
পড়ে থাকে বড়াটা
উঠে পড়ি তখুনি।
লেগে যাই এখুনি
আরবার পড়িতে।
দম দিয়ে ঘড়িতে
নাই কোন নিস্তার
যতকর দরবার।
বাজে ঘাড়ে দশটা
বাতি নেভার কাজটা
শেষ হলে শুতে যাই
মাঝে মাঝে ঘুম পাই
নিয়মের জালে ভাই
প্রান করে আঁই ঢাঁই
নিয়মের নাই ভুল
এটা মোদের স্কুল॥

●

"ভদ্রলোক সে-ই, বড় সে-ই, যে সত্যের উপাসক, যে মনুষ্যত্বকে সমাদর করে।"
—সাদী

রাজেন্দ্রপুর ও জয়দেবপুর এলাকায় শিক্ষাসফরের প্রতিবেদন

মাহমুদ আলী ফারুক
অষ্টম শ্রেণী
স্কুল নং ১৩৮১

২রা জুলাই, সকাল আটটা। সৃষ্টিকর্তার নাম নিয়ে শুরু করলাম যাত্রা। সাথে ছিলেন হেলাল স্যার ও মোস্তাক স্যার। কিছুক্ষনের মাঝেই শহর পেরিয়ে গ্রাম, গ্রামের পর বন আর বন। ঘন সবুজ সব গাছের ডালে পাখীর কলকাকলি সমস্ত পরিবেশকে মোহনীয় করে তুলেছিল।

বাংলার রূপের বাহারে সবাই যখন অন্যমনস্ক, তখন হেলাল স্যার গান ধরলেন, If I love, I will love, I will love my mother, I will love, she will love, we will love together। সাথে আমরা। অতি পরিচিত মালঞ্চ Camping site, রাজেন্দ্রপুর রেল স্টেশনকে পিছনে ফেলে নিভৃত গ্রামাঞ্চলের মাঝ দিয়ে বাস ছুটে চললো কাপাসিয়ার দিকে। একেবারে অপরিচিতি জায়গা দিয়ে চলতে এ্যাডভেঞ্চারের নেশা পেয়ে বসেছিল। একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাস থামলো। ক্ষণিকের স্বাধীনতায় আমরা হারিয়ে গেলাম কাঁঠাল গাছের সারিতে। হেলাল স্যারের বাঁশীর শব্দে ফিরে এলাম বাসে। রাস্তা খারাপ থাকায় আর অগ্রসর হলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাম ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে। ফুলের সাজে সজ্জিত এ উদ্যানে তৃষ্ণার্ত অন্তরকে পানি দিয়ে করলাম শান্ত।

তারপর বাসে করে Joy ride করে পৌঁছলাম [রাজা নরেন্দ্র বাহাদুরের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক জয়দেবপুরে। লিচু বাগানে থামলো বাস। তারপর রাজবাড়ীর সামনে দিয়ে মার্চ করে গেলাম। রাজবাড়ীর দৃশ্য দেখলাম বাইরে থেকে। [তারপর আবার বাসে। দেবদারু গাছ সজ্জিত মনোরম রাস্তা ধরে বাস এসে থামলো স্বর্ণময়ীর ঘাটে।

মাথার উপরে তপ্ত সুর্য। আলস্য পরিহার করে আউটিং-এর প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তৃতা দিলেন হেলাল স্যার। তারপর আহার পর্ব। দীর্ঘ যাত্রা ও ক্লান্তির পর এ আহার ছিল দারুণ তৃপ্তিকর। তবে এ আহার পর্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপারে হলো এই যে, যে ইতিহাস ঘেরা স্থানে মোস্তাক স্যার এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন এক অবিশ্বাস্য

ঘটনার মাধ্যমে। হেলাল স্যারের সাথে চ্যালেঞ্জ দিয়ে ১০৫ কোষ বিশিষ্ট এক বিশালাকার কাঁঠাল সাবার করলেন মুহূর্তের মাঝে।

খাওয়ার পর গেলাম রাজার বোনের মন্দিরে। মুগ্ধ নয়নে অবলোকন করলাম প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন তারপর গেলাম শ্মশানে যেখানে রয়েছে রাজার সমাধি। তার সাথে আরো কয়েকটা সমাধি রয়েছে। তবে রাজার সমাধি ছাড়া বাকীগুলো সময়ের শিকার। শ্মশানের পরিবেশ সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। মোস্তাক স্যারের কাছ থেকে রাজার নাটকীয় জীবন কাহিনী শুনলাম অপূর্ব বিস্ময়ে। মন চলে গেলো অতীতে। বাস্তব ঘটনা কখনো কখনো কল্পনা-কাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায়। তারপর স্পেসিমেন সংগ্রহ।

তারপর? পরিতৃপ্ত মনে বিকেল চারটায় ফিরে এলাম স্কুল চত্বরে।

"যে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বে'র হয়, সে আল্লাহর পথেই চলে।"

—আল-হাদিস

দেশ ভ্রমণ

সাইফুর রহমান
৩য় শ্রেণী
স্কুল নং ২৫৬০

দেশ ভ্রমণে যাবো মোরা
কতই আশা নিয়ে
নানান জিনিস দেখবো মোরা
দেশ বিদেশে গিয়ে।
অনেক কিছু শিখব মোরা
সেখান থেকে ফিরে
আগের মতো বোকা তখন
থাকব আর কিরে?
দেশ বিদেশে মোদের সাথে
সাথী হবে যারা
আনন্দ ও জ্ঞানের মাঝে
থাকবে জেনো তারা।

●

"অধিক এবাদতের চেয়ে অধিক জ্ঞান লাভের চেষ্টা অনেক ভাল।"
—আল-হাদিস

মহানবীর মানব সেবা

রায়হান ইসহাক আহমদ
নবম শ্রেণী (মানবিক বিভাগ)
স্কুল নং ২৪৩১

'মহানবীর মানব সেবা' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। মহানবী মানব জাতির বিভিন্ন শ্রেণী যথা--নর-নারী, ছোট বড়, কিশোর যুবক বৃদ্ধ, মুসলিম অমুসলিম সকলেরই সেবা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শুধু মানব জাতিরই কল্যাণ বহন করিয়া আনেন নাই বরং তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য করুণার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। এখানে আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মহানবীর মানবজাতির সেবা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইব।

তাওহীদের মাধ্যমে মানব সেবা ঃ

তাওহীদের বাণীর মাধ্যমে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মানুষের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। তাওহীদি দুনিয়ায় যে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল তিনি তাহা দূর করিয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন--'আল্লাহ এক। তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি একাই এই নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং সমস্ত স্তব-স্তুতি সমস্ত আনুগত্য উপাসনা তাঁহার প্রাপ্য। এই পৃথিবীতে যে যত বড়ই হউক না কেন মানুষ আল্লাহর শরীক বা অংশী হিসাবে কাহারও উপাসনা করিবে না। এই তাওহীদ মানুষের মেরুদণ্ডে অগাধ শক্তির সঞ্চার করিয়াছে। এই বিশ্বাসের দুর্জয় শক্তিতে সে এক আল্লাহ ভিন্ন দুনিয়ার আর সবার সামনে উন্নত শিরে দাঁড়াইতে পারে। কবির ভাষায় বলিতে হয়--

"সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।"

সাম্যের মাধ্যমে মানব সেবা ঃ

তাওহীদের অন্যতম ফল সাম্য। সবাই আল্লাহর সৃষ্ট। কাজেই সবাই সমান। প্রাচীন ইহুদীরা বিশ্বাস করিত, দুনিয়ায় তাহারাই সেরাজাতি আর সবাই পাপী, ছোটলোক। প্রাচীন গ্রীকেরা মনে করিত গ্রীক ছাড়া আর সব জাতি নিছক বর্বর। প্রাচীন রোমকগণ অ-রোমকগণকে ঐ রূপ চোখেই দেখিত। চীনের এক নাম 'স্বর্গরাজ্য' অর্থাৎ চীন ছাড়া আর

সবদেশ নরক বিশেষ। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে এই যে ভেদের প্রাচীর তাহা বহু বর্ষ হইতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া মানুষের জ্ঞান, পৌরুষ ও আত্মসম্মানকে নীরবে অবহেলা করিতেছিল। তিনি সাম্যের সুশিক্ষার মাধ্যমে সেই পার্থক্য দূরীভূত করিয়া ছিলেন। মহানবী (দঃ) ঘোষণা করিলেন, "ভেদ নাই, ভেদ নাই; মানুষে ভেদ নাই। অ-আরবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, আরবের উপর অ-আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সব মানুষ আদি পিতা আদম (আঃ) এর সন্তান এবং আদম (আঃ) মাটির তৈরী।" অতএব গর্বিত হইবার কিছু নাই। ইহা দ্বারা মহানবী মানুষের হিতার্থে একতার শিক্ষা দান করেন।

মহানবীর অন্যের কাজে সাহায্য ঃ

জনসেবার উজ্জ্বল উদাহরণ মহানবীর জীবনে অগণিত, খাব্বাব ইবনে আরত (রাঃ) নামক একজন সাহাবী যুদ্ধে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার বাড়ীতে আর কোন পুরুষ ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকায় মেয়েদের কার্যের ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। মেয়েরা দুধ দোহন করিতে জানিতেন না। এইজন্য হযুর (দঃ) প্রত্যহ সেই সাহাবীর বাড়িতে গিয়া দুধ দোহন করিয়া আসিতেন। অপরের সেবা এইরূপে তিনি আনজাম দিয়াছিলেন।

অপর ঘটনায় জানা যায় ঃ—

আবিসিনিয়া হইতে আগত প্রতিনিধি দলের লোকদিগকে তিনি নিজ হাতে খিদমত করিয়াছিলেন। সাহাবীগণ আপত্তি করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহারা আমার বন্ধুদের সেবা করিয়াছিলেন আমাকে স্বহস্তে ইহাদের সেবা করিতে দাও।" উল্লেখযোগ্য যে, মক্কার মুসলমানগণ প্রথমতঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন।

অমুসলমানদের সেবায় মহানবী ঃ

হযুর (দঃ)-এর চরিত্র মাধুর্যের দৃষ্টিতে শত্রু মিত্র মুসলিম অমুসলিম সকলে সমান ছিল।

আবু বছরা গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে আমি এক রাত্রে হযুর-র (দঃ) মেহমান হই। ঘরে যে কয়টি বকরী ছিল সব কয়টির দুধ আমি পান করিয়া ফেলি। ফলে সে রাত্রিতে হযুর (দঃ) পরিবার পরিবর্গসহ ক্ষুধার্ত রহিয়া গেলেন। তবু তিনি আমার প্রতি বিরক্ত হন নাই।

একবার কয়েকজন ইহুদী হযুরের দরবারে হাজির হইয়া সালাম বিকৃত করিয়া বলিল "আস্‌সালামু আলাইকুম" অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হউক। এইরূপ ব্যবহার হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ্য করিতে না পারিয়া ইহাদিগকে কঠোর ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন। হযুর (দঃ) আয়েশাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন, "আয়েশা! মুখ খারাপ করিও না। নরম ব্যবহার কর। আল্লাহতালা প্রত্যেক ব্যাপারে কোমলতা পছন্দ করেন।"

নাজরানের খৃষ্টানদের প্রতিনিধি দল মদিনায় আসিলে মহানবী তাহাদিগকে মসজিদে নবীতে অবস্থান করার স্থান করিয়া দেন, নিজে তাহাদের মেহমানদারীর দায়িত্ব পালন করেন। এমনকি তাহাদের উপাসনাদিও মসজিদেই সমাধা করার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মানব সেবার জন্য মহানবী (দঃ) আমরণ সাধনা করিয়া গিয়াছেন। মহানবী তায়েফে গিয়াছিলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন, ব্যবসা বানিজ্য বা যুদ্ধ বিগ্রহের জন্যে

নয়। শুধুমাত্র আল্লাহতাআলার মহিমার বাণী তায়েফবাসীদের কাছে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। তাহারা পাথর মারিয়া তাঁহার পবিত্র দেহকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল। তিনি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। গযবের ফিরিশতারা তায়েফবাসীদের ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন --"না, না, উহারা বাঁচিয়া থাকুক। উহারা যদি আমার কথা না শুনে অন্ততঃ তাহাদের বংশধরেরা শুনিবে।" এইভাবে তিনি তায়েফবাসী তথা জাতির মানব সেবা করিলেন।

শিশুদের প্রতি মহানবীর স্নেহ ঃ

হযুর (দঃ) শিশুদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিলে পথে শিশুদের পাইলে তাহাদিগকে সওয়ারীর উপর তুলিয়া লইতেন।

পথিমধ্যে দেখা হইলে শিশুদিগকে সালাম করিতেন।

নতুন ফসল উঠার সময় কেহ কোন সময় ফল আনিয়া পেশ করিলে ছোট ছোট শিশুদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন। কোলে তুলিয়া আদর করিতেন।

সাহাবী হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "শিশুকালে একদিন আমি হযুর (দঃ)-এর পিছনে নামায পড়িয়া ছিলাম। নামায শেষে বাড়ী ফিরিবার পথে তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলাম। অন্যদিকে হইতেও কয়েকটি শিশু আসিয়া শামিল হইল। হযুর (দঃ) আমাদের সবাইকে ডাকিয়া আদর করিলেন।"

হিজরতের সময় হযুর (দঃ) যখন মদীনায় প্রবেশ করিতেছিলেন তখন আনছারদের ছোট ছোট মেয়েরা পথিপার্শ্বে গীত গাহিয়া সম্বর্ধনা জানাইতেছিল। হযুর (দঃ) তাহাদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওগো, তোমরা কি আমায় ভালবাস? সকলে সমবেত কণ্ঠে যখন জবাব দিল, নিশ্চয়, নিশ্চয়। তখন ইরশাদ করিলেন, "আমি ও তোমাদিগকে ভালবাসি।"

নারী সমাজের সেবায় মহানবী ঃ

প্রাচীন কালের পুরুষেরা নারীকে ভোগ বিলাসের সামগ্রী মনে করিত। আরবের লোকেরা নারীদের সহিত নির্মম ব্যবহার করিত। তাহাদের কোন পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহন করিলে, তাহারা সেই সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। তাহারা মনে করিত কন্যা সন্তান জীবিত থাকিলে তাহাদের ইজ্জত নষ্ট হইয়া যাইবে। আরবেরা নারী জাতিকে গৃহ-পালিত গরু-ছাগলের মত মনে করিত। তাহারা জানিত না মানব জাতির অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার জন্য নারী জাতির প্রয়োজন অপরিহার্য।

দুনিয়ায় অনেক জাতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি হইতে নারী সমাজকে অনেক দূরে রাখে। তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর কোন অংশ নাই। স্বামী গ্রহণ বা ত্যাগের ব্যাপারে নারীর কোন অধিকার নাই। সহমরণ প্রথা ইত্যাদি কুসংস্কার কোন কোন ধর্মে দেখা যায়।

মহানবী সমস্ত ধর্মীয় কাজে নারী সমাজকে পুরুষদের সমান সম্মান দান করিয়াছেন। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতিতে নারী সমাজকে সমান অধিকার দিয়াছেন। বিদ্যা অর্জনে নারী সমাজকে সমান অধিকার দিয়াছেন।

স্বামীর অবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে মৃত স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির বিশেষ অংশের হকদার করা হইয়াছে। পৈত্রিক সম্পত্তিতেও নারীদের জন্য বিশেষ অংশের হকদার করা হইয়াছে। নারীদের প্রতি সৎব্যহারের জন্য বিশেষ আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মহানবী ঘোষণা করিলেন, "যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর কাছে ভাল, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ভাল লোক।" বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসুলুল্লাহ (দঃ) ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমরা নারীদের সম্পর্কে খোদাকে ভয় কর। তাহারা তোমাদের নিকট আমানত স্বরূপ।" তিনি আর ইরশাদ করিয়াছেন, "মায়ের পায়ের তলায় তোমাদের বেহেশত।" মাতৃভক্তি প্রত্যেক সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য। তিনি নারী সমাজকে উচ্চ সম্মানের অধিকার দান করিয়া তাহাদের অশেষ সেবা করিয়াছেন।

দরিদ্র সেবায় মহানবী ঃ

হুযুর (দঃ) দরিদ্রশ্রেণীর জনসাধারণের সংগে এমন মহব্বতের সহিত ব্যবহার করিতেন যে সম্পদ হীনতার দুঃখ তাহারা ভুলিয়া যাইত।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের (রাঃ) মধ্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তা ছিল। তিনি গরীব মুসলিম জনসাধারণের সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একদিন হুযুর (দঃ) বলিলেন, "তোমরা যে জীবিকা লাভ করিতেছ, তাহা এই গরীব জনগণের বদৌলতে আসিয়া থাকে।"

উপসংহার

মহানবী (দঃ) মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানব সেবাকে সবার উপরে স্থান দিয়াছেন। তিনি মানব সেবাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছেন। সেইজন্যে তাঁহার গোটা জীবনের মধ্যে কোন সময় তিনি নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। বরং ক্ষমাসুন্দর চোখে সব সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন।

আধুনিক সমস্যা সংকুল বিশ্বে মহানবীর মানব সেবার আদর্শবাদ বাস্তবায়িত হইলে দুনিয়ার মানুষ শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একই পরিবারে শামিল হইবে। দুনিয়ার মানুষ বেহেশতী সুখের সন্ধান পাইবে।

অবশেষে তাঁহার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

"রাতে এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা সারা রাতের এবাদতের চেয়ে ভাল।"
—আল-হাদিস

আ'মরি বাংলা ভাষা

খালেদা হাসান মাহমুদ
অষ্টম শ্রেণী
স্কুল ১৬১৪

"নানান দেশে নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?"

কথাটা আমার নয়, একজন কবির। কথাটি যে সত্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু বাংলা ভাষা এখনো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের সমকক্ষ হতে পারেনি, এর প্রচুর গুণ থাকা সত্ত্বেও। নিঃসন্দেহে এর কারণ আমরা। আমাদের অনেকেই বাংলা ভাষা না বলাকে আভিজাত্যের লক্ষণ বলে মনে করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। চীনের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই যখন ব্রিটেন গিয়েছিলেন, তখন একজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি কি ইংরেজী ভাষা জানেন না? আর যদি জানেনই তবে আপনি ইংরেজীতে কেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বল্লেন না!" তখন চৌ-এন লাই উত্তরে বল্লেন, "আপনি বোধ হয় জানেন যে, ইংরেজীর উপর অনেক পড়াশুনা করেছি, কিন্তু তবু আমি ইংরেজীকে মাতৃভাষার উপর স্থান দিতে পারিনি হয়ত মাতৃভাষার প্রতি আমার অতিরিক্ত শ্রদ্ধার জন্যই। তাই আমি দোভাষীর আশ্রয় নিয়েছি। তবু নেতা হয়ে মাতৃভাষাকে অপছন্দ করবার প্রয়াস পাইনি।" এ ঘটনা দ্বারাই বোঝা যায় যে, মাতৃভাষা ছিল তাঁদের কাছে প্রাণতুল্য। কিন্তু বাঙালীদের দিকে তাকালে আমরা এর বিপরীতটাই দেখতে পাই। শহরের কাউকে যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করা হয় যে, "আজ বাংলা মাসের কত তারিখ।" সে বলতে পারে না। এর কারন হচ্ছে বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের অনীহা। বাংলা ভাষা আজ অবহেলার শিকার, শহুরে জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের বিবেককে হারিয়ে ফেলেছি। যার জন্য আমরা বাংলা'র মত মহান ভাষার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে অক্ষম। ভাষা যে একটি জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখতে সক্ষম, তার প্রমান পাওয়া যায় জার্মান কিংবা জাপানী জাতির দিকে তাকালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মান ও জাপান উভয়েই ভাষাকে সামনে রেখে অগ্রগতির সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আস্তে আস্তে উপরে উঠেছে। ফ্রান্সে এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায় যে, অন্যের সাথে এমনকি বিদেশী পর্যটকরে সাথে ইংরেজীতে কথা বলে। এমনকি ইংরেজদের দিকে তাকালেও দেখা যায়, তারা ইংরেজীকে কত উচ্চ আসনে বসিয়ে রেখেছে। ইংরেজী আজ আন্তর্জাতিক ভাষা রূপে

স্বীকৃত। অতএব ঐ সব জাতির আদর্শ অনুসরণ করে আমাদেরও এগিয়ে যাওয়া উচিত। তবেই বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষা রূপে স্বীকৃতি পাবে। তবেই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্রের মত বাঙলার সবার আশা পূরণ হবে। যে বাংলাভাষার জন্য সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার আরো অনেকের, যাঁরা ২১শে ফেব্রুয়ারীতে শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের আজন্মের ইচ্ছা যদি আমরা বাস্তবায়ন না করতে পারি তবে তাঁদের সাথে আমরা বিশ্বাসঘাতকতাই শুধু করব না বেঈমানীও করব।

আসুন, আমরা বাংলা ভাষাকে নিয়েই এগিয়ে চলি। বাংলাই হবে আমাদের নূতন পথের দিশারী, চলার পথের পাথেয়।

"জ্ঞানী লোকের কথা শোনা এবং অন্যকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া ধর্মীয় কাজের চেয়ে অনেক ভাল।"

—আল-হাদিস

মা থাকলে কাছে

ইমদাদুল হক
প্রথম শ্রেণী
স্কুল নং ২৫১১

রাতের আঁধার নামছে ঐ
সূর্য গেছে পাটে
মায়ের আঁচল ধরে খোকন
পিছু পিছু হাঁটে।
মা হেসে কন খোকা ওরে
ভয় পেলি কি তুই ?
খোকন বলে ভয় কি মাগো
থাকলে কাছে তুই ?

ভুড়ির বহর

মেহেবুব হোসেন
পঞ্চম শ্রেণী
স্কুল নং ২১২৬

পেটটা আমার
বাড়লো কি !
যাক না বেড়ে
লোকের কি ?
পয়সা নেবো
চারটে ক'রে
চড়তে দেবো
পেটের প'রে।
দেখবে সারা শহরটা
বুঝবে ভুড়ির বহরটা।

মজার ছড়া

সোহেল মাহমুদ মাহবুব পারভেজ
প্রথম শ্রেণী
স্কুল নং ২৫৩২

এক দুই তিন
আজকে খুশীর দিন।
হাসি খেলি নেই ভয়
চার পাঁচ ছয়।
বেলা গেল সন্ধ্যা হোল
সাত আট নয়।
পড়ার সময় পড়তে হবে
কোন কথা নয়।

পাখি

কাজী ইমরান
চতুর্থ শ্রেণী
স্কুল নং ২৩৮৬

পাখির আছে দুটি ডানা
উড়ে চলে দূরে.
সাঁঝ হলে নীড়ে ফিরে
আজানের সুরে।

মৃত্যু

মামুন-আল-রশীদ
ষষ্ঠ শ্রেণী
স্কুল নং ২০৫০

চোখের কোন দিয়ে দর্ দর্ করে গড়িয়ে পড়ছে পানি। দু'দিনের জ্বরে শুকনো দেহটা আরো শুকিয়ে কাঠের মত হয়েছে, চোখ দুটো ঢুকে গিয়েছে ভেতরে। মুখটা শুকনো। কপালে হাত দিয়ে দেখলো, জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছে কচি কপালটা। কাল রাতে দু'টো নভালজিন এনে খাইয়েছিল, কিন্তু জ্বর কমেনি।

—'ময়না, মা, অহনে কেমন লাগতাছে, মা?'—মাথার উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলো ফজলু মিয়া। শুনে ময়না শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিতার দিকে। কথা বললো না, কিংবা হয়তো বলার চেষ্টা করছে, পারছে না।

ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পানির বাটিটা নিয়ে আসলো, তারপর শিয়রে বসে ছেঁড়া এক নেকড়া দিয়ে কপালে জল-পট্টি দিতে লাগলো। অর্ধ-মুদিত চোখে তাকিয়ে আছে ময়না। ওর দিকে তাকাতে পারছে না অক্ষম এই বৃদ্ধ পিতা। সংসারের ঘানি টানতে টানতে বুকের হাঁড় গুলো ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে, যদিও সংসার বলতে বাপ ও মেয়ে--মাত্র দু'টি প্রাণী নিয়ে। কিন্তু কবর খোড়ার আয় দিয়ে কোনমতে দিন চলে না। অনাহার ও অর্ধাহারের ছাপ রয়েছে ওদের শরীরের প্রতি অঙ্গে।

—'ফজলু ভাই, ও ফজলু ভাই। তাড়াতাড়ি কর, আইজ খুব দেরী অইয়্যা গ্যাছে,। —বলতে বলতে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো করিম। তারা দু'জনে এক সাথে কাজ করে কবরস্থানে। অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ফজলু করিমের দিকে। চোখে পানি টল্‌টল্ করছে। করিমের কথার উত্তরে কিছু বললো না। চুপ-চাপ জলপট্টি দিতে লাগলো। নড়া-চড়ার মতো শক্তি নাই। তবু যেতেই হবে। ঘরে খাবার কিছু নেই। গতকাল পাঁচ টাকা পেয়েছিল। এক সের চাল, আর ময়নার জন্য রুটি কিনতেই তা খরচ হয়ে গেল। তাকে খেতে হবে। মেয়ের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু মন উঠছে না। করিম বুঝতে পারলো সবই, চুপচাপ রইলো।

চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি পড়লো ময়নার চোখের উপর। চমকে ওঠলো মেয়েটা। বাবার দিকে তাকিয়ে কি একটা বলতে চাইলো। ঠোঁট দু'টো নড়লো, কিন্তু কোন কথা বেরোল না।

—"চুপ-চাপ শুইয়্যা থাক্ মা। তোর লাইগ্যা বিস্কুট আনুম, মা।"—ভাঙ্গা গলায় কথাগুলো বলে মেয়ের দিকে তাকিয়েই উঠে দাঁড়াতে চাইলো, কিন্তু নীচু ঘরের ছাদের সাথে ধাককা লাগলো মাথার। করিম ততক্ষনে বেরিয়ে গেছে। ময়না চেয়ে আছে বাবার দিকে। সেই শূন্য দৃষ্টি। বাইর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে আবার এক নজর দেখলো মেয়েকে।

কাওরান বাজার থেকে হেঁটে বনানী কবরস্থানে যেতে যেতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। খুব রোদ পড়ছে। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। কোন লোকজন নেই। বসে পড়লো এক জায়গায়। অপেক্ষা করতে লাগলো, দুপুর গড়িয়ে গেলো, কিন্তু কবর খোঁড়ার কোন কাজ পাওয়া গেল না। হতাশায় ভরে উঠলো ফজলু মিয়ার মনটা। কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসলো কণ্ঠ। অভিমান ভরা কণ্ঠে সে বললো --'করিম, এই ঢাকা শহরে কি আইজ একটা লোকও মরে নাই?"--করিমের মুখ থেকে বেরিয়ে এল—আস্তাগ ফেরুল্লাহ, মানুষের অমঙ্গল চাইতে নেই।"

সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। বাড়ীতে যেতে হবে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা বেদনার রাগে রক্তিম করছে পৃথিবীকে। হতাশ, বিষন্ন এক পিতার হৃদয়ে উথাল পাথাল বেদনা যেন সমগ্র বিশ্ব-ব্যাপী পরিব্যপ্ত হয়েছে।

দরজাটা আস্তে আস্তে ফাঁক করে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে একটু থমকালো। বিস্কুট আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ময়নাকে এখন সে কি বলবে? বাষ্পরুদ্ধ কান্নার আবেগ ধলে পড়তে পড়তে কোন রকমে ভেতরে ঢুকলো। অর্ধ-নিমিলিত নয়নে চেয়ে রয়েছে ময়না, মাথাটা কিঞ্চিৎ হেলানো। শুকনো মুখটা যেন কোন প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে সূর্যের লালা আভার রেশ পড়েছে কচি মুখে।

শিয়রে বসে ডাকলো,—'ময়না, মা ময়না।'--ফিরলো না ময়না। নড়া চড়াও করলো না। কপালে হাত রেখে আবার ডাকলো--'ময়না।'—কপালটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কেঁপে উঠলো বুকটা। মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে জোরে ডাকলো—'ময়না'।--মাথাটা হেলে পড়লো অপরদিকে, উচ্চৈস্বরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো—'ম-য়-না।'

কেন সে আজ বলেছিল—ঢাকা শহরে কেউ কি মরে না?—মৃত্যুশোক ছাপিয়ে এই প্রশ্নই নিরক্ষর পিতৃহৃদয়ে অহরহ গুমরিয়ে মরছে। ময়না যেন মরে গিয়েই তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল।

"আজ যারা কবরস্থানে লাশ নিয়ে আসে, আগামী কাল তারাই লাশ হয়ে আসবে।"

●

"যারা নিজেরা নিজেদের শিক্ষাকে জীবনে পালন করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের মালিক।" —আল-হাদিস

বৃষ্টি নামে

আহমদ গিয়াসউদ্দিন এহসান
দ্বিতীয় শ্রেণী
স্কুল নং ২৩৬১

বৃষ্টি ঝরে টুপটাপ
ঘরে থাকি চুপচাপ।
কি কোরব ভাবছি তাই
ঝালমুড়ি ছোলা খাই।
খেলার সময় এলো
বৃষ্টি থেমে গেলো।

ফল কেনা

মাহবুব রহমান
তৃতীয় শ্রেণী
স্কুল নং ২২১২

আনারস আতা আর
পাকা কালোজাম
দোকান ভরা আছে আরও
লিচু, কলা আম।
শানু মামা সাহস করে
জিগেস করে দাম
দাম শুনেই পালায় ছুটে
গায়ে ঝরে ঘাম।

খোকা বলে

মোঃ মোহসীন আলী
দ্বিতীয় শ্রেণী
স্কুল নং ২৩৬৩

মেঘ করেছে আকাশে
বাদল নামছে ওই
আমি বলি মাগো শোনো
মেঘ ডাকছে ওই।
মা বলেন, নারে খোকা
বাজ পড়ছে ওই,
খোকা বলে, বাজ কোথা মা
মেঘ ডাকছে ওই॥

গামা হবো

মোঃ সদরুল আমীন
চতুর্থ শ্রেণী
স্কুল নং ২৩৮৭

গায়ে আমার শক্তি অনেক
বলেছে আমার মামা
আমি নাকি চেষ্টা করলে
হতে পারব গামা।
তাইত আমি খাচ্ছি ছোলা,
দিচ্ছি কষে ডন,
ভবিষ্যতে হবোই গামা
এই করেছি পণ।

পদ্মাপাড়ের মাঝি

এস, এম, আবদুল মালেক
নবম বিজ্ঞান
স্কুল নং ২৫৮০

—নেও মিঞা। —আবুমোল্লাকে হুকাটা এগিয়ে দেয় গনিমাঝী। হুকা হাতে নিতে নিতে প্রশ্ন করে আবুমোল্লা—তা মিঞা অহন কামাই রোজী কেমন চলতাছে?

—ঐডা কইয়া আর দুখ বাড়াইঅনা মোল্লার পো। —দ্বিতীয় প্রশ্ন করার জন্য অপেক্ষা করেনা আবুমোল্লা। নৌকা থেকে নেমে সোজা গ্রামের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়।

—তোমার মাইয়াডা ভাল আছেতো?—কথাটা ঠিক আবু মোল্লার কর্ণগোচর হলো কিনা বুঝা গেল না।

পদ্মানদীর পাড়ে গনিমাঝীর বাপদাদার ভিটে। এখানেই তার দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলার একমাত্র জায়গা।

সারাদিন খেয়াপারাপার করে যা পায় তাতে কোনরকমে দিন গুজরান হয়। সংসার ঠিক বলা যাবে না। বাড়ীতে শুধু বিধবা এক বোন। স্ত্রী পুত্র সেবারের কলেরায় মারা গেছে। বেঁচে ছিল শুধু ছোট মেয়ে কুলছুম! সারাদিন সে বাপের সাথে সাথে থাকতো। নিজেকে শান্তনা দেওয়ার মত এটুকুও বুঝি গনিমাঝীর কপালে সইলো না। একদিন সাঁঝের বেলা সর্বনাশী পদ্মার করাল গ্রাস কুলছুমকে নিয়ে গেল গনিমাঝীর বুক থেকে। অকালেই তাকে আলোকের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন থেকে চিরতমাসাচ্ছন্ন মৃত্যুলোকের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হলো।

সেই থেকে বেশীর ভাগ সময়ই নৌকোতে কাটায় গনিমাঝী, ইচ্ছে হলে বাড়ীতে যায়, আবার দু'চার দিনেও একবার যায়না।

—মাছ পাইছনি কিছু?

পাশের গ্রামের আতরালীর সাথে সৌহার্দ্য বিনিময় করে নেয় গনিমাঝী।

—হ! পাইছি দু'গগা।

—মাইয়াডা ভাল আছে তো?

যার ছোট মেয়ে আছে তাকেই জিজ্ঞেস করবে মেয়ের কুশল। তার মেয়ে থাকলে হয়তো অন্য কেউ তাকেও এমনিভাবে প্রশ্ন করতো।

আজ নৌকাতে বাপমায়ের সাথে একটি মেয়ে দেখে নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ল। কুলছুম হয়তো এতদিনে এই মেয়েটির মত হতো। নৌকো ছেড়ে দেয় গনিমাঝী। বিড় বিড়

করে কি বলছে ঠিকা বুঝা যায়না। বার বার ছোট মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে। অস্তমিত সূর্যের পানে চেয়ে চোখে জল এলো গনিমাঝীর। এমনই এক সন্ধ্যায় সে চিরজীবনের মত কুলছুমকে হারিয়েছে। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল সবার অজান্তে। বৈঠার উপর ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে, যেন তার দুঃখকে ব্যঙ্গ করছে। উছলা ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার চোখের পানি বাষ্প হয়ে যায়। কঠোর হয়ে উঠে তার মুখভাব। হিংস্রতার ছাপ ধরা পড়ে তার চেহারায়। —'রাক্ষুসী গাং' !—বিষমাখানো আক্রোশ ঝরে পড়ে গনিমাঝীর কণ্ঠ থেকে।

নৌকা ভিড়ল। যাত্রীরা দেনা মিটিয়ে যেযার পথে চলে গেল। চুপ করে বসে রইল গনিমাঝী, কত মানুষকে পার করেছে তার নৌকোয় করে, তার দক্ষ হাতের জোরে কত যাত্রী ঢেউয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু সে তার কুলছুমকে ধরে রাখতে পারেনি, বেদনার বিয়াবানে তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। বৃন্তচ্যুত পুষ্পকলিকার মত তার জীবন থেকে একে একে ঝরে গেছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। প্রিয়জনদের অকাল তিরোধানে তার জীবনে নেমে এসেছে সাহারা শুন্যতা। অতিদুঃখে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে। কান্নাও যেন আর আসতে চায়না। প্রথম প্রথম বেদনা সামলাতে না পেরে কাঁদতো গনিমাঝী। পরে আর কাঁদতে পারেনি, হয়তো চোখের পানি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

আজ অনেকদিন পর আবার খেয়া পারাপার করছে গনিমাঝী। যাত্রীরা উঠছে একে একে। গনিমাঝীর মুখে হাসি নেই। সারা মুখ ছেয়ে আছে বিষণ্ণতার কালিমায়। বহুদিন পর তার ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল।

ইতিমধ্যে যাত্রীরা নৌকা ছেড়ে চলে গেছে। আবার লোকজন একে একে আসতে শুরু করেছে। কত চেনা-অচেনা মুখ দেখে গনিমাঝী, কত লোক তার চোখের সম্মুখ দিয়ে যায় আসে প্রতিদিন, আসেনা শুধু তার স্ত্রী-পুত্র, অসেনা তার কুলছুম। আজ আর নিজেকে সামলাতে পারলো না গনিমাঝী আজ যেন তার চোখের পানি ফিরে এসেছে; বজ্রপাতের মত হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠলো গনিমাঝী। উপুর হয়ে পড়ে রইল অনেকক্ষণ। কেউ তার দুঃখ বুঝলনা, কেউ শুনলো না তার গলাফাটা কান্না। শুধু পাশের কাশবন মৃদু দুলে দুলে তার দুঃখে সমবেদনা জানালো।

সেদিন ভীষণ ঝড় উঠল। আকাশে বাতাসে যেন শুরু হলো দৈত্য দানবের তাণ্ডব নৃত্য। পৃথিবীর সমস্ত কিছু যেন আর্ত চিৎকারে ফেটে পড়েছে। এরি মধ্যে আকাশ বাতাস বিস্ফারিত করে—"আল্লারে" !—বলে কে যেন চিৎকার করে উঠল। তারপর সব নীরব, নিস্তব্ধ।

পরদিন নদীর তীরে কোন জন মানব বা নৌকার চিহ্ন দেখা গেল না। শুধু একটা চাদর দেখা গেল কাশবনের সাথে জড়িয়ে ভাসতে। বুঝতে বাকী রইলো না চাদরটা গনি মাঝীর। চাদরটা ভাসছে আর বুঝিয়ে দিচ্ছে গতরাতের "আল্লারে" ! বলে চিৎকারের কথা। জানিয়ে দিচ্ছে এক দুঃখী মাঝীর তিরোধান।

"লেখাপড়ার সময় দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।" —আল-হাদিস

ঢাকার মিরপুর চিড়িয়াখানায় শিক্ষা সফরের প্রতিবেদন

এম, এ, কাজমী
সপ্তম শ্রেণী
স্কুল নং ২৪২২

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর আমরা ঢাকার মিরপুর চিড়িয়াখানায় এক সংক্ষিপ্ত সফরে যাই। বলাবাহুল্য নূতন বাসে আমরাই সর্বপ্রথম বাইরে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। সকাল সাড়ে আটটায় আমরা উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে স্কুল চত্বর ত্যাগ করলাম। আমাদের সাথে ছিলেন জনাব মোস্তাক স্যার, জনাব আজাদুল কবির স্যার, মিসেস ইসলাম টিচার এবং একাদশ বিজ্ঞানের বড় ভাই বীরুপাক্ষ পাল ও হাফিজুল হায়দার। চিড়িয়াখানায় পৌঁছে আমরা সামান্য অপেক্ষা করলাম বুকিং এর জন্য। একটু পরে আমরা জনাব মোস্তাক স্যার এবং জনাব আজাদুল কবির স্যারের নেতৃত্বে চিড়িয়াখানায় ঢুকলাম। ঢুকার সাথে সাথে পরিবেশিত হলো চীনা বাদাম। প্রথমেই আমাদের চোখে পড়লো রেসাস্ বানর। তারা লাফাচ্ছে, মা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। সাথেই দেখলাম হনুমান, বিরাট লেজওয়ালা। হনুমান দেখে হাঁটতে লাগলাম। একটু পরেই দেখলাম কালোবাঘ, সাথে ডোরাওয়ালা চিতা বাঘও দেখলাম, এরপর বিভিন্ন চতুষ্পদ প্রাণী যেমন —ভোঁদর, খরগোশ, লাজুক বানর প্রভৃতি চোখে পড়লো, একটু এগিয়ে যাওয়ার পর চোখে পড়লো, নানা জাতের পাখী তারপর পাশা-পাশি রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং পশুরাজ সিংহ দেখতে পেলাম। সামনে গিয়ে দেখলাম কুমীর। সেখানে অজস্র পয়সা পড়ে আছে। একটু পরে দেখলাম বিভিন্ন জাতের মোরগ মুরগী। সামনে দেখলাম সদ্য আমদানীকৃত চিড়িয়াখানার অন্যতম আকর্ষণ শিম্পাঞ্জী, কয়েকটি ফুটবল এবং কয়েকটি ঝুলানো টিউব। সেখান থেকে খানিক দূরে কয়েকটি টিলার মত দেখলাম। উৎসুক নয়নে কাছে গিয়ে দেখি হাতি। হাতির কার্যকলাপ দেখে ডানদিকে মোড় নিতেই দেখলাম গাধা। গাধার চারিদিকে যে বেষ্টনি আছে, ইচ্ছে করলেই গাধা তা পার হতে পারে। কিন্তু বোধহয় সেই বুদ্ধিটুকু গাধার মাথায় আজ পর্যন্ত আসেনি। সামনেই দেখলাম ঘোড়া। ঘোড়া দেখে সামনে চোখে পড়লো বিভিন্ন জাতের গরু। আমরা ক্ষানিক বিশ্রাম করে এবং আমাদের দৈনন্দিন টিফিন খেয়ে হাঁটতে লাগলাম কিছুদূর যেয়ে দেখলাম সুন্দর মুক্ত পরিবেশে রয়েছে হরিণ। হরিণ দেখার পর আমরা চিড়িয়াখানার যাদুঘর দেখার জন্য স্যারদের কাছে আবেদন করলাম, মোস্তাক স্যার এবং কবির স্যার তাতে রাজী হলেন।

আমরা যাদুঘরের প্রবেশ দ্বারে দেখলাম দুটো বিকট অজগর সাপের মমী। তারপরেই বিভিন্ন জীব-জন্তুর মমী। তারপর দেখলাম তিমি মাছের বিকট মাথার খুলির অংশ, তারপর ছ'পা বিশিষ্ট অদ্ভুত ছাগল দেখতে পেলাম।

যাদুঘর থেকে বেরিয়ে বোটানিকাল গার্ডেনে পা বাড়ালাম। সুন্দর মনোরম পরিবেশ সেখানে সুন্দর বাঁশ ঝাড়, শাল বন, দেবদারু বন ক্রীষ্টমামন্ত্রির বন ও পদ্ম পুকুর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। যেখানে দেশী ও বিদেশী ফুলের বিপুল সমাহার। কার্পেটের মতো ঘাস সেখানে। বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখে স্কুল অভিমুখে রওয়ানা দিলাম। বেলা তখন পৌণে একটা।

সফর আমাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হয়েছে এরজন্য আমরা সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

●

"খারাপ লোকের সংগে থাকার চেয়ে একা থাকা ভাল ; একা থাকার চেয়ে ভাল লোকের সংগে থাকা অনেক ভাল। চুপ্‌চাপ থাকার চেয়ে জ্ঞান অন্বেষণকারীর সংগে আলাপ করা অনেক ভাল এবং খারাপ কথা বলার চেয়ে চুপ্‌ থাকা অনেক ভাল।"

—আল-হাদিস

ডেন্টিংপেন্টিং

সাদ ওমর
ষষ্ঠ শ্রেণী
স্কুল নং ১৮১১

ডেন্টিং পেন্টিং
ফিনিশিং টাচ্
ঘুমের ঘোরে
ভূতের নাচ।
নাচতে নাচতে
চিৎ পটাং
ভাংলো আমার
দাদুর ঠ্যাং।
ঠ্যাং সারাতে
থাইল্যাণ্ড
উঠলো বেজে
স্কুল ব্যাণ্ড।
ফিরলো দাদু
আনলো ক্র্যাচ
ডেন্টিং পেন্টিং
ফিনিশিং টাচ॥

আহ্বান

তোফায়েল আহমেদ
ষষ্ঠ শ্রেণী
স্কুল নং ২০৫৩

ওরে স্কাউট দল
নিয়ম মেনে চল,
দেশকে রক্ষা করবি বল
সত্যের পথে চল।
তোরাই দেশের ভবিষ্যৎ
তোরাই হবি মহৎ
হবি তোরা সৎ
খোলা সত্যের পথ।

আমাদের দেশ

সৈয়দ জামিল আব্দাল
নবম শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ
স্কুল নং ২২৭৭

সুদূর গ্রামের সুন্দর সবুজ ধান,
ঘর-বাড়ী, নদ-নদী জুড়ায় মোর প্রাণ,
উড়ে কত শালিক-পায়রা ঝাঁকে ঝাঁকে,
মনে হয় যেন মোদের ইশারায় ডাকে;
কৃষকের সুখ-ভরা সুন্দর অন্তর,
সুরভিত স্নিগ্ধরূপী শ্যামল প্রান্তর;
এই মোর মায়াময় সোনালী দেশ,
সুন্দর সবুজ প্রান্তর নেই যার শেষ;
প্রকৃতির মমতা-জড়ানো আবেশ,
এই মোর মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

নামের ছড়া

সাব্বির শফিউল্লাহ
৫ম শ্রেণী
স্কুল নং ২২২৪

খোলামেলা শহর তবু
ঢাকা কেন বলো
বন্ধ নয় কিছুই তার
তবু খুলনা কেন হোল?
পাবনা জেলায় পাবে তুমি
মন যা তোমার চায়
রংপুরে রঙের মেলা
নেই কোথাও ভাই।
নামের ভেতর এমন অমিল
বলো কেন হয়
ভাবো বসে চুপটি করে
কথাটি আর নয়॥

সাহায্য নয় সহযোগিতা

কাজী শাহাদত হোসেন
দ্বাদশ বিজ্ঞান
স্কুল নং ২৪৯৪

আত্মনির্ভরশীলতাই আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। আমরা দরিদ্র, আমরা অনেক দেশের তুলনায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর ; কিন্তু তাই বলে আমরা অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারিনা। ক্রমাগত অন্যের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা ভিক্ষাবৃত্তিরই নামান্তর। তবে আমরা সহযোগিতা চাইতে পারি উঠে দাঁড়ানোর জন্য এবং উঠে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে সহযোগিতা ফিরিয়েও দিতে পারি। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়াসে সকল পর্যায়েই আত্মনির্ভরশীলতাকে মূলতন্ত্র হিসাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে অন্য দেশের অর্থনৈতিক সাহায্যের উপর নির্ভর যেমন আমাদের পরিহার করতে হবে তেমনি আভ্যন্তরীন পর্যায়েও প্রকাশন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজেদের শ্রমেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করে তুলতে হবে। স্বাধীনতার পরবর্তী তিন সাড়ে তিন বছর অর্থনৈতিক ব্যর্থতা ও বৈদেশিক সাহায্যের অপচয়, অপব্যয়ের দরুন আমাদের দেশ বিদেশীদের কাছে একটি 'তলা শূন্য' ঝুড়ি হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। আমাদের ক্ষুধা, দারিদ্র্য উপহাসের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল অন্যের কাছে। গত দুই আড়াই বছরে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, এখন গ্রাম-গ্রামান্তরে থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সহজেই চোখে পড়ে। স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ হচ্ছে, কাজ চলছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের অধীনে। কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে পল্লী অঞ্চলের মানুষ এখন সক্রিয়ভাবে শরিক হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য, গড়ে উঠছে উন্নয়নের অনুকূল আবহাওয়া।

সাহায্য চাই না, তবে সহযোগিতা চাই—একথা বলার অর্থ মস্তবড় চ্যালেঞ্জ গ্রহন করা। এই চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমের ও কর্মনিষ্ঠার। কাজের সকল পর্যায়ে আমাদের সংগঠিত হতে হবে এবং নিজেদের শ্রমেই সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের অর্জন করতে হবে সমৃদ্ধি। শ্রম, আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মপ্রত্যয়ই হবে আমাদের প্রধান অবলম্বন। সকল পর্যায়ে পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে নির্ভরশীল হতে হবে নিজেদের শ্রমের উপর।

●

তাঁবুবাসের মধুর স্মৃতি

মোঃ শরীফ হোসেন খান
দ্বাদশ বিজ্ঞান
স্কুল নং ১৭০৪

স্কুলের ছকে বাঁধা দিনগুলো যখন ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে, বৈচিত্রহীন একঘেয়েমিতে মন যখন হাঁপিয়ে উঠে তখন তাঁবুবাসের কয়েকটি দিনের মধুর রঙিন স্মৃতি ভেসে ওঠে আমাদের মানসপটে। তাঁবুবাসের স্মৃতি এত গভীরভাবে আমাদের হৃদয়ে রেখাপাত করে যা জীবনে মুছবার নয়—ভুলবার নয়। প্রত্যেক ছাত্র-শিক্ষকের বছরের সোনারঙের দিনগুলি অতিবাহিত হয় এসময়। স্কুলের রুটিনবাঁধা একঘেয়ে জীবন থেকে ক্ষনিকের তরে 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' ছায়া-ঢাকা, পাখী-ডাকা গ্রামবাংলার স্নিগ্ধ গাঢ় সবুজের গভীরতায় আমরা হারিয়ে যাই এই ক্যাম্পিং-এ।

গতবছরের মত এবারও আমাদের স্কুলের বার্ষিক তাঁবুবাস রাজেন্দ্রপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিং-এর একদিন আগে অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারী দু'জন স্যার সহ আট/নজন ছেলে চলে গিয়েছিল আমাদের থাকার জন্যে তাঁবু লাগানো ও পরিপার্শ্বের এলাকাকে আমাদের বাসোপযোগী করে তুলবার প্রাথমিক কাজগুলি করতে। আমাদের স্কুল বাস ও অন্য একটি বাসে করে আমরা পরদিন রাজেন্দ্রপুরের উদ্দেশ্য যাত্রা করি। পথে চিরসবুজ বাংলার প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে, গান গাইতে গাইতে চলছিলাম আমরা। খাঁচার পাখী মুক্তি পেলে যেমন আনন্দ পায় তেমনি তখন আমাদের মনেও ছিল অফুরন্ত আনন্দ। তেঁজগাও, বনানী, টঙ্গী ছেড়ে, ন্যাশনাল পার্ককে ডানপাশে ফেলে শালবন পরিবেশিত রাস্তা দিয়ে যথাসময়ে আমরা আমাদের নির্ধারিত জায়গা মালঞ্চ বিশ্রামাগার 'বিনোদনে' উপস্থিত হলাম। বাস থেকে আমরা সারিবদ্ধভাবে যার যার তাঁবুতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়লাম।

এবারে গ্রুপের বা দলের নাম রাখা হয়েছিল নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর নামানুসারে। যেমনঃ মেঘনা, ইছামতি, গোমতী, কপোতাক্ষ, করোতোয়া, কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গা, তিস্তা, পদ্মা, সুরমা, রূপসা, ধলেশ্বরী ও মধুমতি। প্রতিবারের মত এবারও প্রত্যেক ক্লাসে দুটি করে গ্রুপ ছিল।

আমাদের বিপদসঙ্কুল এই জীবনে শত শত বাধা বিপত্তি আসে। কিন্তু সেই প্রতিবন্ধকতা পর্বতপ্রমাণ হলেও তা কিভাবে ডিঙানো যায় তার শিক্ষা দেয় অব্‌সটাকল রেস। অব্‌সটাকল রেসে বিভিন্ন দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হত অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এবং স্থির মস্তিষ্কে। ড্রামের তৈরী ভেলার সাহায্যে পুকুর পার হওয়া, ক্রলিং করা, বনজঙ্গল ও বন্ধুর পথ বেয়ে দৌড়ান ইত্যাদি অব্‌সটাকল রেসের অংশ।

ছাত্রাবাসের মত এখানেও কিন্তু আমাদের ভোরে উঠতে হত পি,টি, করার জন্যে। ক্যাম্পিং-এ প্রতিদিন বিকেলে খেলাধূলারও ব্যবস্থা করা হত। এছাড়া ক্রস কান্ট্রিতে গিয়ে আমরা আশেপাশের অধিবাসীদের সাথে পরিচিত হই এবং তাদের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করি। ক্যাম্পিং-এ স্কাউট ও কাবদেরকেও নিয়মিত ট্রেনিং দেয়া হয়।

তাঁবুবাসের আরেকটি মজার প্রোগ্রাম ছিল হাইকিং। রুটিন অনুসারে প্রতিদিন দু'টি করে দল ক্যাম্প সাইট থেকে চাল-ডাল-তেল-নুন লাকড়ি ইত্যাদি ৩।৪ মাইল বহন করে নিয়ে সেখানে মজা করে বনভোজন করে। হাইকিং-এ যেতে যেতে আমরা উপভোগ করি গ্রামবাংলার নিসর্গকে ও পরিচিত হই সাধারণ মানুষের সাথে। বনভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরই আমরা ফিরে আসি আমাদের কেন্দ্রবিন্দুতে।

স্পেসিমেন সংগ্রহ তাঁবুবাসের একটি শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম। প্রতিদিন দুটি গ্রুপের ছাত্ররা উদ্ভিদ বিদ্যা ও প্রাণীবিজ্ঞানের শিক্ষকসহ ক্যাম্পের আশেপাশে বেড়িয়ে পড়তাম নতুন স্পেসিমেন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এ থেকে জীববিজ্ঞানের বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছিলাম।

বিগওয়াক ছিল এবারের ক্যাম্পিং-এর আরেকটি অন্যতম আকর্ষণ। ক্যাম্প এলাকার ৫ মাইল দূর থেকে ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে একটানা দ্রুতগতিতে হেঁটে ক্যাম্পসাইটে এসেছিলাম আমরা। রাস্তায় আসতে আমাদের এতটুকু ক্লান্তি স্পর্শ করতে পারেনি বরং আমরা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে সম্মিলিত স্রোতের মত সমবেতকণ্ঠে গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হচ্ছিলাম ক্যাম্প এলাকার দিকে।

তাঁবুবাসের সবচেয়ে আনন্দদায়ক ও মনোমুগ্ধকর প্রোগ্রাম হল তাঁবু জলসা। সন্ধ্যার কিছু পরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চতুর্পার্শ্ব ঘিরে জমে ওঠে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। প্রত্যেক গ্রুপ থেকে ছেলেরা এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে থাকে। ইয়েল, পপ সঙ্গীত, স্বরচিত গান, জারী, প্যারাডি কবিতা ও গান, তাল-বেতালের খবর, কৌতুক, নাচ ইত্যাদি প্রদর্শিত হয় এ মনোরম অনুষ্ঠানে। ছাত্রদের অনুরোধে স্যাররাও আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করেছিলেন এই ক্যাম্প ফায়ারে। সারাদিনের পরিশ্রম, ক্লান্তি সব নিমেষে উবে যায় তাঁবু জলসার আগুন ও প্রোগ্রামর উষ্ণ পরশ পেয়ে। তাঁবু জলসা আমাদের মনে আনে এক স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

সংগ্রামমুখর জীবনে যেমন সকলক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে হয় তেমনি তাঁবুবাসেও অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হত প্রতিযোগিতা নিয়ে। প্রত্যেক তাঁবুর আশে-পাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার, থালা-বাসন, বিছানাপত্র ইত্যাদি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখতে হত। সকালে আমাদের স্যারেরাই বিচারক হিসেবে তাঁবু পরিদর্শনে বের হতেন। এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রতিযোগিতা হাইকিং, বিগওয়াক, ক্রস কান্ট্রি, পিটি, অবস্টাকল রেস, খেলাধূলা স্পেসিমেন সংগ্রহ, তাঁবু জলসা—এসবের উপরই নম্বর ছিল। প্রতিদিন সকালে অ্যাসেম্বলীতে দিনের কর্মসূচী ও প্রত্যেক গ্রুপের ফলাফল ঘোষণা করা হত। উল্লেখ্য সব মিলিয়ে এবারে তাঁবুবাসে ১ম, ২য় ও ৩য় হয়েছে যথাক্রমে দ্বাদশ শ্রেণীর যমুনা গ্রুপ, দশম শ্রেণীর করোতোয়া গ্রুপ ও দ্বাদশ শ্রেণীর মেঘনা গ্রুপ।

বস্তুতঃ আমাদের একঘেয়ে রুটিনবাঁধা জীবনে তাঁবুবাস একটি মধুর স্মৃতি বিজড়িত শিক্ষাভিত্তিক বিনোদনমূলক কর্মসূচী। তাঁবুবাস আমাদের দেয় যেমন নির্মল আনন্দ তেমনি শিক্ষা দেয় কঠোর পরিশ্রমের, ধৈর্যের ও সহিষ্ণুতার। সর্বোপরি এ থেকে আমরা লাভ করি বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা। বছরের পাতা ঘুরে আসা তাঁবু-বাস প্রত্যেকের জীবনে স্মরণীয় ও মধুময় হয়ে উঠুক--এই কামনা করি।

দাদুর টাক

ওমর ফারুক
৫ম শ্রেণী
স্কুল নং ২২৬৪

বাক বাকুম বাক বাক
দাদুর মাথায় মস্ত টাক
টাক নয়ত খেলার মাঠ
চৈত্র মাসের শুকনো ঘাট।
দিনে সেথা মাছি বসে
রাতের বেলায় মশা
চটাং চটাং বাড়ী খেয়ে
দাদুর করুণ দশা।

বৃষ্টির ছড়া

মোসাদ্দেক আলী মোল্লা
পঞ্চম শ্রেণী
স্কুল নং ২২০৭

রুম ঝুমা ঝুমা নূপুর বাজে
বৃষ্টি নামে সকাল সাঁঝে॥
বর্ষা রাণীর পরশ মেখে
জুঁই চামেলী উঠল জেগে॥
রিম ঝিমাঝিম টাপুর টুপুর
বৃষ্টি ঝরে সকলি দুপুর!

শিম্পু আর টিম্পু

জুবায়ের আলী
ষষ্ঠ শ্রেণী,
স্কুল নং ২১২২

সুন্দরবনের খুড়তুতে ভাই জাঞ্জিবারে থাকে,
সবাই তাকে আদর করে "শিম্পু নামে ডাকে"।
শিম্পু খুড়ো বিষম বুড়ো, মনটি বেজায় সাদা,
দশ কুড়ি তার বয়েস হলেও একেবারে হাঁদা।
ভাগ্নে তাহার টিম্পু থাকে সিঙ্গাপুরের পাশে,
ছুটি-ছাটায় সময় পেলে মামার কাছে আসে।
মামার বাড়ি টিম্পু এসে পেটটি ভরে খায়,
শরীরটাকে চাঙ্গা করে ক'দিন পরে যায়।
টিম্পু সেবার আসলো হেথায় ঈদের ছুটি পেয়ে,
পেটটাকে সে ঢোল বানালো বেজায় খাবার খেয়ে।
তারপরে তার পেট বাবাজী ভীষণ হলো বেজার,
হাড্ডি-ক'খান শরীর নিয়ে ফিরতে হলো এ-বার।

বারমুদা ট্র্যাঙ্গেল

হুমায়ুন কবীর
দ্বাদশ বিজ্ঞান
স্কুল নং ২৪৮১

আটলান্টিক মহাসাগরের ছোট্ট একটি দ্বীপ বারমুদা। ১৫১৫ খ্রীঃ জোহায় বামুর্জ নামে একজন ব্রিটিশ নাবিক সর্বপ্রথম এটা আবিষ্কার করেন। তারই নামানুসারে এই দ্বীপের নাম রাখা হয় 'বারমুদা (Bermuda)। এরপর কেটে গেছে অনেক বছর। বারমুদা দ্বীপের গুরুত্বও বেড়েছে ধীরে ধীরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বারমুদা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্যস্ততম ঘাঁটি। এর আগেও বহুবার বহুভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বারমুদাকে। এভাবেই ধীরে ধীরে বারমুদা পোর্টোরিকো এবং ফ্লোরিডাকে নিয়ে ত্রিকোণাকার আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চলটি পরিণত হয়েছে পৃথিবীর ব্যস্ততম যোগাযোগ মাধ্যমরূপে।

কিন্তু প্রকৃতি যেন তার খেয়ালী হাতে সাজিয়েছে এই বিশ্বকে এবং তারই বিচিত্র খেয়ালের এক জ্বলন্ত উদাহরণ বারমুদা। পোর্টোরিকো এবং ফ্লোরিডাকে ঘিরে রহস্যময় ত্রিকোণাকৃতি এই স্থানটি একনামে আজ বারমুদা ট্র্যাঙ্গেল বলে পরিচিত।

রহস্যাবৃত এই বারমুদা ট্র্যাঙ্গেল সর্বপ্রথম এক দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধরা দেয় মানুষের কাছে। তারিখটি ছিল ১৯৪৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর। বেলা ঠিক ২টা ৩০ মিনিটে ফ্লোরিডা বিমানঘাটি হতে পোর্টোরিকোর (Pureto Rico) উদ্দেশে যাত্রা করে পাঁচটি টর্পেডো বম্বার সম্বলিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্কোয়াড্রন—১৯'। বিমান পাঁচটিতে ছিল সর্বমোট ১৪ জন চৌকশ বৈমানিক। আবহাওয়া ছিল চমৎকার।

বেলা ঠিক ৩-৩০ মিনিটের সময় মিয়ামী বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারে ভেসে এলো এক অপ্রত্যাশিত রেডিও মেসেজ "Squadron Commander speaking ...... We are in t–r–o–u–b–l–e we are of course out of sight of land. I repeat land is no-where to be seen ...... We cant identify our location! We don't know where we are ......Even the ocean don't look the same." এই মেসেজ বিনা মেঘে বজ্রপাত করলো মিয়ামী বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারে। কারণ এই সুন্দর আবহাওয়ায় এই ধরনের মেসেজ ছিল সকলেরই ভাবনার অতীত। ধীরে ধীরে রেডিও কম্যুনিকেশন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মিয়ামীর সাথে। সর্বশেষ যে মেসেজটি আসে তা হলো—"We are plunging into white water ......, we are lost.' কিন্তু মিয়ামী বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে ছিল এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কারণ বারমুদা সংলগ্ন জলরাশির অর্থাৎ যে বারমুদা ট্র্যাঙ্গেলের ওপর দিয়ে আসছিল বিমানগুলি, তার পানির রং

ছিল নীল এবং কেবলমাত্র উত্তর আমেরিকার নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট যেখানে ল্যাব্রাডার ও উত্তর আটলান্টিক স্রোত একত্রিত হয়েছে সেখানকার পানির রং সাদা। কারণ উষ্ণ ও শীতল স্রোতদ্বয়ের মিশ্রণের ফলে এখানে অত্যন্ত কুয়াশার সৃষ্টি হয়। তাই দূর হতে এই পানিকে সাদা মনে হয়। কিন্তু বারমুদা থেকে ল্যাব্রাডার তো হাজার মাইলের পথ তাই 'সাদা পানি' দেখতে পাওয়াতো একেবারেই অসম্ভব। এই মেসেজ পাওয়ার পর ১৩ জন crew নিয়ে একটি উদ্ধারকারী helicopter ঘটনাস্থলের দিকে দ্রুত যাত্রা করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই helicopter-এর সাথেও Control tower-এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ১০ মিনিট পরে।

ঐ একই দিনে রাত্রি ন'টায় মিয়ামী বিমানবন্দরের control tower--'Ft' নামক এক সংক্ষিপ্ত রেডিও মেসেজ পায়। কিন্তু 'Ft' ছিল সেই হারিয়ে যাওয়া বিমানবহরের সাংকেতিক বার্তা (Code message)। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সেই বিমানগুলোতে সর্বমোট ৫ ঘন্টা উড্ডয়নের তৈল ছিল এবং সেই হিসাবে বেলা ৭-৩০ মিনিটের সময় তাদের তৈল শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ তার দু'ঘন্টা পরেও তারা কিভাবে বিমান হতে উদ্ধার সংকেত পাঠায়। কারণ উড়ন্ত অবস্থায় তৈল শেষ হয়ে গেলে fuel tank বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়ার কথা। অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা সমস্ত বিমানের।

তার পরের দিন ৩০০ বিমান, কয়েক ডজন জাহাজ ও শত শত Yatch ও Motor Boat দিয়ে বারমুদা ট্র্যাঙ্গেলের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখা হয়। কিন্তু জীবন তো দূরেই থাক, সেই স্কোয়াড্রন-১৯ এর কোনও বিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেল না।

এভাবে একের পর এক বারমুদা ট্র্যাঙ্গেলে ঘটতে থাকে আশ্চর্য সব ঘটনা। বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করে দেখলেন ১৯৪৫ সাল হতে আজ পর্যন্ত ১০০ টিরও বেশী জাহাজ ও ১০টিরও অধিক বিমান হারিয়ে গেছে বারমুদা ট্র্যাঙ্গেলের অতল রহস্যের গভীরে। তাই বারমুদা বৈজ্ঞানিকদের কাছে, বিশ্বের মানব সমাজের কাছে, এক বিরাট challenge স্বরূপ!

এই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ১৯৭০ সালে সর্বপ্রথম Japan এবং America-র বৈজ্ঞানিকরা দীর্ঘ চার মাস যাবৎ বারমুদা ট্র্যাঙ্গেলে সম্মিলিত ভাবে গবেষণা চালান। তাদের মতে বারমুদা ট্র্যাঙ্গেলের আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তনের ফলে মাঝে মাঝে air hole-এর সৃষ্টি হয়। এবং এই air hole-এ পড়েই বিমানগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে! কিন্তু বিমান না হয় পড়লো air hole-এ কিন্তু জাহাজগুলো! সমুদ্রে আর কোন water hole-এর সৃষ্টি হয় না। অথচ ভোজবাজীর মত হারিয়ে গেছে ১০০টি জাহাজ। তাই তাদের সাথে কেউই একমত হলেন না।

১৯৭৩ সালে বারমুদা দিলে নতুন চমক। এই বৎসর ১৩ই এপ্রিল বেলা ঠিক ২-৩০ মিনিটের সময় বারমুদার st. Goerge সমুদ্র বন্দরের Control tower-এ Anita নামক Norwegian জাহাজ হতে এলো এক অদ্ভুত মেসেজ "Our device going out of order; sky turning yellow. We have lost our location। এর কিছুক্ষণ পরেই Anita-র সাথে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে st. Goerge-এর যোগাযোগ।

এই মেসেজ পাওয়ার পর বৈজ্ঞানিকরা সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বারমুদা ট্র্যাঙ্গেলকে দেখতে শুরু করলেন। এরই ফলস্বরূপ ১৯৭৫ সালে পূর্বে প্রাপ্ত তিনটি মেসেজের উপর

ভিত্তি করে Soviet Union ও America যৌথভাবে এক শক্তিশালী পর্যবেক্ষক দল গঠন করেন। এই মেসেজ তিনটি হলো--

(১) ১৯৪৫ সালে Squadron-19 থেকে প্রাপ্ত —'water looks white.'

(২) ১৯৪৮ সালে মিয়ামীর (Miami) উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী এক বিমান হতে প্রাপ্ত —as if falling into some hole in the atmosphere. এবং

(৩) ১৯৭৩ সালে Anita-থেকে প্রাপ্ত—sky turning yellow.

১৯৭৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে এ পর্যবেক্ষক দল তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। তা' থেকে জানা যায় যে, বারমুদা ট্র্যাঙ্গেলের নিকট উষ্ণ উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং শীতল (অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ) দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত একত্রিত হয় ফলে অনেক সময় স্বাভাবিক আবহাওয়াও এখানে অত্যন্ত কুয়াশার সৃষ্টি হয়। এ কুয়াশার জন্য দূর হতে এই জলরাশিকে 'সাদা' মনে হয় এবং অনেক সময় ঘন কুয়াশার উপর বিশেষ করে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত দ্বারা বাহিত বিশাল কমলা রংয়ের iceberg সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করলে নীল আকাশকে হলুদ দেখায়। তারা আরও বলছেন যে, আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যম হতে ঘন মাধ্যমে গেলে তার দিক বদলে যায়। এই কারণে জাহাজ বা বিমানগুলো যখন এই ক্ষণস্থায়ী ঘন কুয়াশার ঝড়ে পড়ে তখন তাদের 'sestant' যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। ফলে হারিয়ে ফেলে তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের নির্দিষ্ট পথ থেকে তারা সরে যায়। হয়তো এই জন্যই তাদের ধ্বংসাবশেষ নির্দিষ্ট জায়গায় পাওয়া যায় না।

এভাবেই তারা বারমুদা ট্র্যাঙ্গেলের অন্তর্নিহিত রহস্যের সমাপ্তি টানতে চেয়েছেন। কিন্তু অনেকেই তাদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাই বারমুদা আজও লুক্কায়িত আছে রহস্যের নীল অতলান্তে। কিন্তু ইতিহাস কথা কয় যে, রহস্য চিরদিন রহস্য থাকে না। যে চাঁদের দেশ ছিল মানুষের কাছে অলীক নিতান্তই কল্পনার বস্তু--Fiction-এর উপজীব্য। আজ মানুষ তার রহস্যের অবগুণ্ঠন উম্মিলিত করেছে। মানুষ কালিক প্রবাহের সমান্তরালে পাড়ি জমিয়েছে বহু রহস্যাঞ্জিত অভিযাত্রায়। আর সাথে সাথে তার অক্লান্ত পরিশ্রম আর অফুরন্ত অনুসন্ধিৎসার সোপান বেয়ে পেঁৗছে গেছে সাফল্যের সোনালী সিংহদ্বারে--কৃতকার্যতার রূপালী সৈকতে। তাই আকাশের অসীম নীলে--সমুদ্রের নিতল অতলান্তে--সর্বত্রই তার বিপত্তিহীন পরিব্রাজনা। একইভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মত বারমুদা ট্র্যাঙ্গেল যে চিরদিন রহস্যাবৃত থাকবে না--একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মানুষ তার অক্লান্ত পরিশ্রমের বিশাল সমুদ্র পেরিয়ে নিশ্চয়ই একদিন এই দুর্ভেদ্য বারমুদা ট্র্যাঙ্গেলের অন্তঃ রহস্যের অন্তঃসহ পরিমণ্ডলে পরিভ্রমণ করবেই করবে।

●

ছড়া

মোঃ মঈনী আল কাশেম
ষষ্ঠ শ্রেণী
স্কুল নং ২৬৫৭

এক যে আছে পালোয়ান
খায় শুধু পান।
খেয়ে দেয়ে শুয়ে শুয়ে
জুড়ে দেয় গান।
গান গাওয়া শেষ হলে
কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে।
ব্যায়াম করা শেষ হলে
ছোলা খায় ডালা ভরে।
কাঁধে তোলে বড় বড় কামান
নাম তার কালু মিয়া পালোয়ান!

পেলে

হাবিব আহমেদ
সপ্তম শ্রেণী
স্কুল নং ১৩৬৮

এক যে ছিল ছেলে
নাম তার পেলে।
দেখতে সে কালো
খেলত সে ভালো।
বল যদি পেত
গোলে ঠেলে দিতো।
যদিও সে কালো,
নিগ্রো হলেও ভালো।
দেশ তার ব্রাজিলে,
নাম জানে সকলে।

টাকার জোর

জাকিরুল ইসলাম
পঞ্চম শ্রেণী
স্কুল নং ১৮৩০

ভাই, টাকা, টাকা, টাকা
না হলে যে সবই ফাঁকা।
খেতে পরতে লাগে টাকা
পড়তে লিখতে আরো টাকা।
বাঁচতে টাকা মরতে টাকা
টাকা ছাড়া সকল ফাঁকা।
টাকার জোরই সবখানে
এরই জোরে সবাই মানে।
থাকলে টাকা মন্দ ভালো,
ঢাললে টাকা আরো ভালো।
বন্ধু জোটে সোজাসুজি
লাগে নাকো খোঁজাখুঁজি।
দুনিয়াটার সকল চাকা
ঘোরায় জেনো এই টাকা।

ছত্রাকের কথা

বিকাশ কুমার মজুমদার
দ্বাদশ বিজ্ঞান
স্কুল নং ২৪৬৩

প্লানটা এটেছিল তপুই। অপুকে বলল—'মোক্ষম সময়--তুই নিয়ে আয়গে বয়েম শুদ্ধ। আমি এখানেই থাকব।'

—'আচ্ছা'—সুবোধ ছেলের মত ঘাড় দুলিয়ে অপু পা বাড়ালো রান্নাঘরের দিকে। ওটা আবার আম্মার শোবার ঘরের পাশেই। ঘুমন্ত আম্মাকে পাশ কাটিয়ে অপু বয়েমটার গায়ে হাত রাখল। জিবেয় প্রায় জল এসেছিল আর কি! আর একটু হলেই পড়ে যেত।

'সাব্বাস অপু!'--চাপড় মারল তপু অপুর ঘাড়ে—'চল যাই ছোটকার ঘরে'—তপু অপুকে নিয়ে যায় এক রাশ হাসি ছড়িয়ে।

বয়েমের মুখটা খুলে আঙ্গুলটা একটু বাঁকিয়ে খানিকটা আচার তুলেই তপু বলল,--'এ মা একি! এতে যে ছাতা পড়েছে'।

'তাইতো!'—কাঁদো কাঁদো স্বরে অপু বললে।

'কি হয়েছে রে অপু তপু'—ওপাশ থেকে ছোটকা বললেন।

'এই দেখনা ছোটকা--ছাতা গুলো এত পাজী যে, আচারের গায়ে দিব্যি বসে আছে। এখন এগুলো খাই কি করে!'

'তোরা খেতে পাচ্ছিস না এগুলো কিন্তু এমন কতকদেশের মানুষ আছে যারা এগুলো একদিন না খেলে মনে তৃপ্তি পায় না'—

'ওয়াক থুঃ'--অপু তপু এক সাথে রিরি করে উঠে।

'তুমি আমাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছো ছোটকা আমরা বুঝি কিছুই বুঝি না, তাই না?'—অপু বললে।

'আ-হা তা হবে কেন?'—ছোটকা আশ্বাসের স্বরে বল্লে।—'তোরা তো জানিস না, তাই এমনটি বলছিস।'

'কি এমন কথা ছত্রাক সম্পর্কে যা আমরা জানি না—।

'তোরা শুনবি তাহলে?'

'হ্যাঁ আমরা শুনবো।'—দুজনাই বলে উঠে

'শোন তবে'—ছোটকা এক আঙ্গুল নস্যি ডান নাকে ঢুকিয়ে জোরে একটা কাশি দিয়ে বলতে শুরু করে—'বল দেখি, পৃথিবীতে যত গাছপালা আছে, তাদের ক ভাগে ভাগ করা যায়?'

দু'জনার হাত ইতিমধ্যে মাথায় উঠে চুলকাতে শুরু করেছে।

'থাক, আমি বলছি'—ছোটকা বলে।

'দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সপুষ্পক আর অপুষ্পক। সপুষ্পক হলো যার ফুল আছে। আর অপুষ্পক হলো যার ফুল নেই। এই ছত্রাক হলো অপুষ্পক উদ্ভিদ—এর পাতা, ফুল, মূল কাণ্ড কিছুই নেই।'

'তাহলে এর বংশবৃদ্ধি হয় কি ভাবে?' —অপু প্রশ্ন করে।

'আশ্চর্যের কথা হলো, ছত্রাকের যে অংশ মাটিতে পড়ে তা থেকে নতুন ছত্রাক জন্ম নেয় অথবা ছত্রাকের কোন অংশে অনুবীজের সৃষ্টি হলে তা থেকে নতুন ছত্রাক জন্মায়। মাটির সাথে বা অন্য বস্তুর সাথে সমান ভাবে লেপটে থাকে বলে একে সমাঙ্গ বলে।'

'ছত্রাকে কিন্তু ক্লোরোফিল থাকে না।'

'ক্লোরোফিল কি ছোটকা'—অপু জিজ্ঞেস করে।

'ক্লোরোফিল এক ধরনের রঙীন পদার্থ। গাছের পাতা সবুজ হওয়ার জন্য এই ক্লোরোফিলই দায়ী। ক্লোরোফিল নেই বলে ছত্রাকে যেখানে সেখানে জন্মায়--পানিতে, মাটিতে, জীবিত বা মৃত গাছে, প্রাণীর দেহে এমনকি তোর ঐ আচারেও। এরা নিজেদের খাবার নিজেরা প্রস্তুত করে নিতে পারে না। আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ দেহ থেকে খাদ্যরস শোষণ করে এরা বেঁচে থাকে। যেগুলো জীবিত গাছে বা দেহে জন্মায় সেগুলোকে বলে পরজীবি এবং যেগুলো মৃতদেহ জন্মায় তাদের মৃতজীবি বলা হয়।'

'ছত্রাক কিন্তু আমাদের ক্ষতি করে।'

'কেমন করে ছোটকা'--ছোট্ট অপুর মিষ্টি প্রশ্ন।

'বলছি--পরজীবি ছত্রাক গম, ধান, আলু ইত্যাদি ফসলের অনেক ক্ষতি করে। এইসব উদ্ভিদের রোগের পিছনে রয়েছে ছত্রাকের অবদান। আবার মানুষের নাক, কান, ফুসফুস অনেক সময় ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়।'

'আচ্ছা ছোটকা, তোতার গায়ে যে ছোপ ছোপ দাগ ওগুলো কি?'—তপুর মন জানতে চাইল।

'সুন্দর প্রশ্ন করেছিস তপু। ওগুলো কিন্তু এক ধরনের ছত্রাক যা আমাদের সমূহ ক্ষতি করে থাকে।'

'শুধু ক্ষতিকর দিকটা দেখলেই চলবে না এর গুণগত দিকটাও একবার দেখা উচিত। ছত্রাক আমাদের অনেক উপকার করে থাকে। অনেক ধরনের ছত্রাক ঔষধ তৈয়ারীতে লাগে।...আচ্ছা বলতো, পেনিসিলিন কে আবিষ্কার করেন?'

'ইয়ে মানে--ও হ্যাঁ মনে পড়েছে আলেকজাণ্ডার ফ্যান'—তপু গর্বের সাথে বলে।

'ফ্যান নয়, আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং—। তা যা বলছিলাম—এই পেনিসিলিন তৈরী করতে ছত্রাকের সাহায্য নিতে হয়। পেনিসিলিন আবিষ্কার হবার পর তা ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হতে থাকে।'

'তারপর, ধর কলকারখানার কাজে ছত্রাকের অবদানের কথা। রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি হালকা ও ফোলানোর জন্য ছত্রাকের প্রয়োজন হয়। নানা রকম এসিড তৈরীর কাজেও এটা ব্যবহৃত হয়। অন্য উপায়ের চাইতে এই উপায়ে এসিড তৈরী করা সহজতর। কৃষি কাজেও এর অবদান ভুলবার নয়। আক্রমনাত্মক জাতীয় ছত্রাক মৃত আগাছা ধ্বংস করে এবং সারে পরিণত করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং সর্বোপরি কোন গাছে শিকড়ের সাথে জড়িয়ে থেকে গাছের দেহে খাদ্য সরবরাহ করে।'

'এই হলো ছত্রাকের কথা'

'বাপরে এত কিছু!'—অপু বিস্ময়ের সাথে স্বগতোক্তি করে এক দৃষ্টে আচারের সাথে লেপটে যাওয়া ছত্রাকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

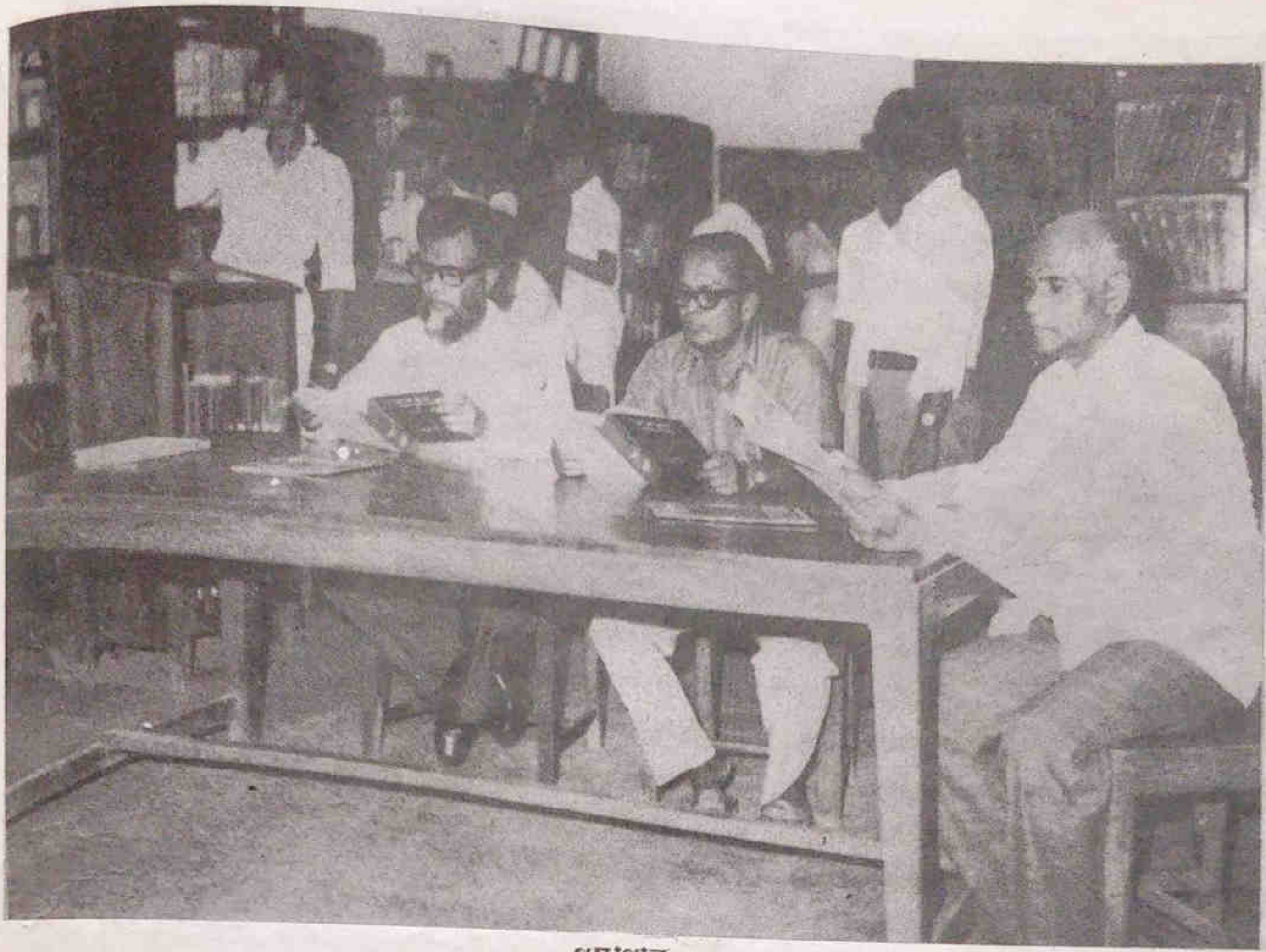

গ্রন্থাগার

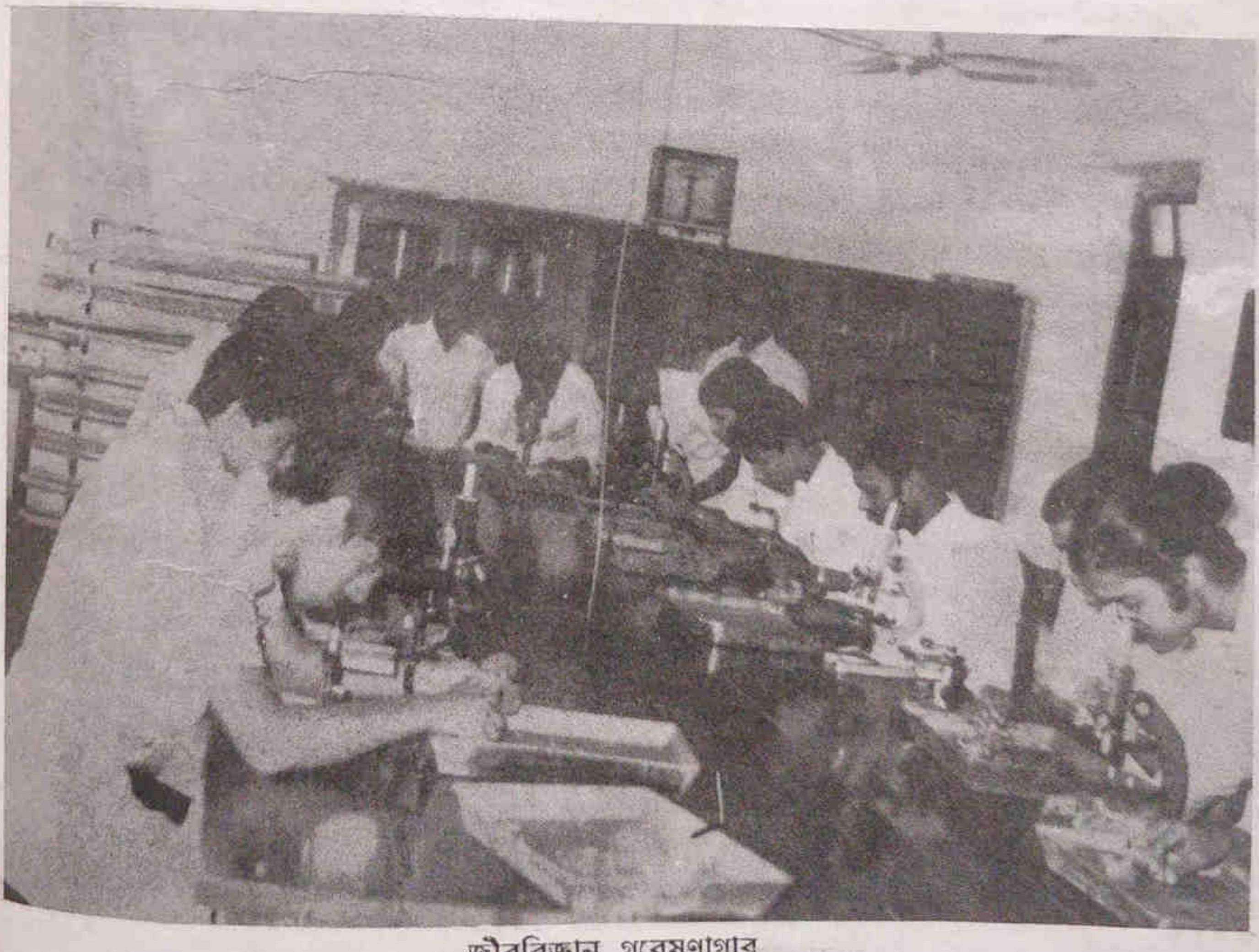

জীববিজ্ঞান গবেষণাগার

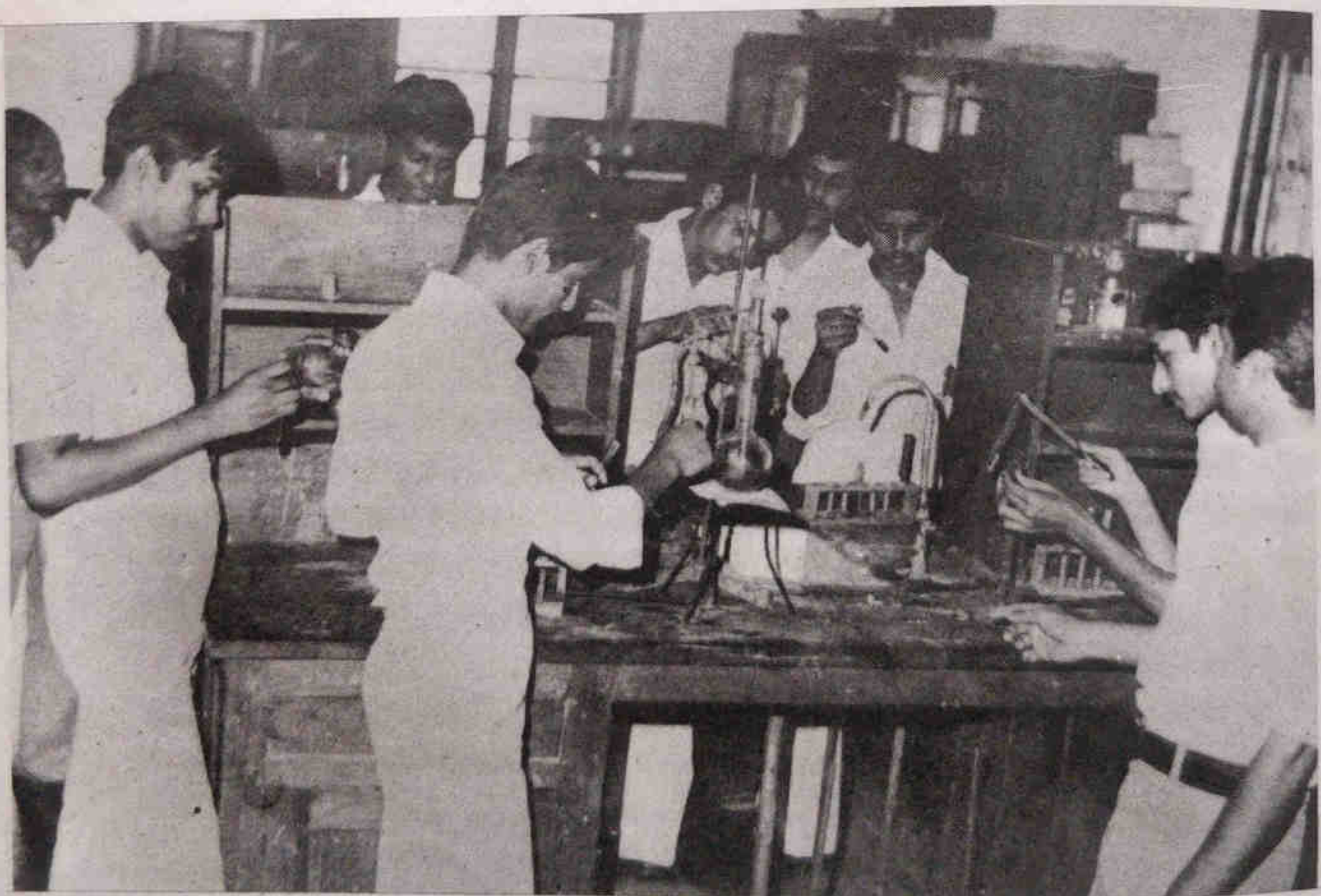

গবেষণাগার--পদার্থ, রসায়ন

মানব জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ

কাজী দীন মোহাম্মদ (খসরু)
একাদশ বিজ্ঞান
স্কুল নং ২১০০

জীবনের এই মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালাকে অতিক্রম করে মানুষকে তার মহা গন্তব্যস্থল অনন্ত শান্তির রাজ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন জীবন তরীর সঠিক পরিচালনা এবং এই পরিচালনার জন্য প্রয়োজন একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত জীবন-বিধান আর ইসলামই একমাত্র জীবনবিধান যার মধ্যে রয়েছে এই পরিচালনার মহাশক্তি। একমাত্র ইসলামী জীবন পদ্ধতিই মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। সুতরাং ইসলামী বিধানে পরিচালিত মানব সমাজে প্রবাহিত হয় সুখ, শান্তি ও আদর্শ জীবনের ঝর্ণা।

ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবন পদ্ধতি। মানব জীবনের পূর্ণতাদানে সম্পূর্ণ সক্ষম। তাই ইসলামকে এক উত্তম জীবন দর্শন এবং জীবন যাপনের উৎকৃষ্ট উপায় বলা হয়। কারণ ইসলাম জীবনকে কোন একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে দেখে না বা কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। জীবনের প্রতিটি দিকে ইসলামের দৃষ্টি প্রসারিত এবং তার পরিধি অত্যন্ত সুবিস্তৃত। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সমন্বয়ে জীবন সম্পর্কে এক সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভংগীর উপর ইসলামী বিধান রচিত। তাই ইসলাম একটি বিশদ ও পূর্ণ জীবন সংহিতা আর এজন্যই মানব জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ অপরিসীম।

আদি নবী হযরত আদম (আঃ)-এর সময় হতে আরম্ভ হয় ইসলামী জীবনধারা। কিন্তু সে সময়ের ইসলাম ছিল সদ্য ও অপূর্ণ। তারপর এই মহান জীবনধারাকে অক্ষুন্ন রাখার প্রচেষ্টায় একে একে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন লক্ষাধিক পয়গম্বর। অবশেষে আল্লার পেয়ারা মানুষ--'আশরাফুল মাখলকাত'--যখন ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে দিনে দিনে এগিয়ে যাচ্ছিল অমানিশার অন্ধকারের দিকে--তলিয়ে যাচ্ছিল পাপের অতলান্ত সাগরে--পদার্পণ করেছিল ধ্বংসের মুখে ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহ পাক সমগ্র মানবজাতির প্রতি রহমত স্বরূপ মহা নবী রূপে প্রেরণ করলেন হযরত মোহাম্মদ (সঃ)--কে--নূতনভাবে উদিত হল ইসলামের দীপ্ত সূর্য আরবের ধূসর মরুভূমির আকাশে এবং ধীরে ধীরে তার আলোক ছটা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি অলিতে-গলিতে। আর তাঁর মাধ্যমেই পৃথিবীতে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল আল্লার মনোনীত জীবন বিধান--ইসলাম। মহানবী (সঃ) তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় মিথ্যা, অজ্ঞতা ও বহুবাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা করেছেন একত্ববাদ, জ্বালিয়েছেন অজ্ঞতা দূরকারী জ্ঞানের মশাল এবং মানবজাতির

পথ প্রদর্শক হিসাবে দিয়ে গেছেন একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত জীবন বিধান— ইসলাম। মানব জাতির দিশারী ও সকল সমস্যা সমাধানের জন্য--তাঁর জীবন কালেই ঘটনাচক্রে ধীরে ধীরে প্রেরিত হয়েছে ঐশী বাণী—আল্লার পছন্দনীয় সমাধনে--১১৪টি সূরা সমন্বিত আল-কুরআন। আর সব শেষে আল্লাহ মানবজাতির প্রতি তাঁর নেয়ামত ও মনোনীত জীবন বিধানের পূর্ণতা দান করে ঘোষণা করলেন--

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ط

অর্থাৎ--"আজিকার এই দিনে তোমাদের জন্য আমার নেয়ামত পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং একমাত্র জীবন বিধান হিসাবে ইসলামকে পূর্ণ করিয়া দিলাম।" তবে ইসলাম নিশ্চল নহে— গতিশীল। তাই ইসলামের বিস্তৃতির সাথে বহুমুখী সমস্যা দেখা দিতে থাকলে কোরান ও হাদীসের আলোকে ইহার সমাধানমূলক ব্যবস্থা হতে থাকে। কোরান, হাদীসে মীমাংসিত বিধানে দক্ষ এমন সব ফকিহ বা ধর্মীয় আইনে বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের প্রচেষ্টা দ্বারা নূতন সমস্যার মুকাবিলা করে ইহার সমাধান দিতে থাকেন। ফলে ইসলামী জীবন ধারায় গতিশীলতার নীতি প্রবর্তিত হতে থাকে। তাই আজ মানুষের ব্যক্তিগত বা পারস্পরিক সুখ-সুবিধা ও উন্নতির জন্য যে সমস্ত বিধানাদির অবশ্যক ইসলামে তার পূর্ণ ব্যবস্থা বিদ্যমান ইসলামে দেশ বা জাতি ভেদাভেদ নেই। সমগ্র বিশ্বের মানবজাতিকে নিয়ে এক মহাজাতি, মুসলমান গঠন করা ইহার উদ্দেশ্য। যার মৌলিক ভাবধারা এক ও অভিন্ন।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম দিয়েছে এক পরিপূর্ণ কর্মসূচী। ইহাতে মানুষের ধর্মকর্ম, পারিবারিক, সামাজিক, দেওয়ানী, ফৌজদারী, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সুব্যবস্থাবলী বিদ্যমান। ধর্মানুষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে জীবন যাত্রার দৈনন্দিন কাজ কারবার; মানবাত্মার মুক্তি হতে শারিরীক সুস্থতা, দল বা সম্প্রদায়ের দাবী-দাওয়া হতে আরম্ভ করে ব্যক্তি বিশেষের দাবী-দাওয়া; সৎস্বভাব ও সদাচারের বিবৃতি হতে পাপাচারের বিবৃতি এবং ঐহিক কর্মস্থল হতে পারত্রিক কর্মফলের বিবৃতি ইত্যাদি সব কিছুই ইহাতে গুরুত্বপূর্ণভাবে সন্নিবেশিত আছে। দৈনন্দিন জীবনের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সবই ইসলামে সুন্দরভাবে উল্লেখিত আছে এবং তাহা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুতঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারই প্রতীক।

আধুনিক যুগে মানবজীবন পরিচালিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পন্থায়। বিজ্ঞানের নানাবিধ বিস্ময়কর আবিষ্কারে মানব জীবন হয়ে উঠেছে সহজ। কিন্তু ইসলামতো বিজ্ঞানকে বিরোধিতা করে না। বরং সহযোগীতা করে। কারণ ইসলাম প্রবর্তক মোহাম্মদ (সঃ) -এর জীবনের প্রতিটি কর্ম ছিল গভীর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যপূর্ণ। আর তাইতো বর্তমান বিশ্বের সকল বৈজ্ঞানিকেরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, মহানবী (সঃ) ছিলেন সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক। মহানবীর কর্ম পদ্ধতি ও কোরানকে বিশ্লেষণ করেই বিজ্ঞানীরা সকল বিস্ময়কর আবিষ্কারের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। সুতরাং ইসলামই বিজ্ঞানের মূল উৎস।

ইসলামের পরিধি অত্যন্ত সুবিস্তৃত হলেও পাঁচটি প্রধান স্তম্ভের উপর ইসলামী জীবন বিধান নির্মিত। স্তম্ভ পাঁচটি হল :

- কলেমা
- নামাজ

- রোজা
- যাকাত ও
- হজ্জ

কলেমার উদ্দেশ্য আল্লার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নাই। তিনিই আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ত্রাণকর্তা, রুজিদাতা এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য। কলেমার এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ কখনও অপরের কাছে হাত পাততে পারে না। পারে না কারো কাছে মাথা নত করতে। ফলে সমাজ থেকে বিতাড়িত হয় শ্রেণী বিভেদ। দেখা দেয় শান্তি।

নামাজ মানবজাতির প্রতি আল্লার উপঢৌকন। নামাজ মানুষকে সকল পাপাচার ও পঙ্কিলতা থেকে দূরে রাখে এবং মানুষকে আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন--"নামাজ পড়, বাস্তবিকই নামাজ মানুষকে অশোভন ও খারাপ কাজ হইতে দূরে রাখে।" নামাজ মানবজাতির মধ্যে এক সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ইহার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ভালবাসা ও সমঝোতার ভাব জেগে উঠে। জামাতে নামাজ আদায়ের সময় সকলকেই সারিবদ্ধভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হয় এবং একই ঈমামকে অনুসরণ করতে হয়। বাদশা-ফকির ; ধনী-নির্ধন কোন ভেদাভেদ থাকে না। ফলে প্রতিটি মানুষের মনে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং একতার ভাব জেগে উঠে। আবার একই ঈমামকে অনুসরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে তারা শৃংখলা রক্ষা ও মনোনীত নেতার আনুগত্য স্বীকার করার শক্তি অর্জন করে। নামাজের এই মহান শিক্ষা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে রূপায়িত হতে থাকলে একদিন তা বিশ্ববাসীর মহা একত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে এবং মানব সভ্যতার স্থায়িত্ব আনয়ন করবে। নামাজ মানুষের কর্মে প্রেরণা যোগায়, দূর করে শিথিলতা। মানবজীবনের সর্বাধিক প্রগতিক্ষেত্রে অলস নিষ্কর্মা লোককে ইহা অদম্য কর্মবীর করে তোলে। প্রকৃত পক্ষে নামাজ সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। তাই মানবজীবনে নামাজের গুরুত্ব ও মূল্যবোধ অপরিসীম।

আত্মসংযম ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই রোজার মুখ্য উদ্দেশ্য। একাধারে একমাস অর্থাৎ রমজান মাসে রোজা পালন করে প্রত্যেক মানুষকে আত্মশুদ্ধি লাভ করতে হয়। সূর্য উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার ও পাপাচার থেকে বিরত থাকাকে রোজা বলে। আত্মশুদ্ধি ব্যতীত খোদার নৈকট্য লাভ করা যায় না ; আত্ম-কামনা পরিত্যাগ করতে না পারলে আত্মশুদ্ধি সম্ভবপর নহে। রোযা মানুষকে আত্ম-কামনা, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা ও পশুত্ব মনোভাব থেকে মুক্তি দেয়। তাই রোযার মাসকে 'ট্রেনিং পিরিয়ড' বলা হয়। অর্থাৎ রোযার মাধ্যমে মানুষ তার রিপুগুলি দমন করার ট্রেনিং প্রাপ্ত হয় এবং তার দ্বারা মানুষ আগামী একটি বছর শান্তিময় জীবন যাপন করতে সমর্থ হয়। এভাবে প্রতি বৎসরে রোযার ট্রেনিং-এ মানবজীবন হয়ে উঠে সুখ ও শান্তিময়। তা ছাড়া কোরানে বলা হয়েছে "যাহারা রিপুগুলিকে দমন করিয়া খাঁটি পথে অটল থাকিবে তাহাদিগকে অগণিত পুরস্কার প্রদান করা হইবে।" আর রোজাই সহজ উপায়ে রিপুদমনের একমাত্র সহায়ক। রোজা মানুষের নৈতিক মান বহুগুণে বর্ধিত করে। ইহা ধনী নির্ধন সকলের উপর সমভাবে ফরজ। ফলে ধনী দরিদ্রে মিলন সংঘটিত হয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধে সকলেই উদ্বুদ্ধ হয়। তাছাড়া রোজার

সময় পানাহার থেকে বিরত থেকে ধনীরা গরীবদের কষ্টের কিছুটা আভাস পায়। ফলে গরীবদের প্রতি সহানুভূতির ভাব জেগে উঠে। তাই নীতিগত হিসাবে রোজা মানুষের মাঝে সাম্য, ঐক্য, ভ্রাতৃত্বের ভাব সৃষ্টি করে।

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা বা যা পবিত্র করে, শোধন করে, বর্ধন করে। নিজের ও পরিবারের বাৎসরিক যাবতীয় খরচের পর যে অতিরিক্ত অর্থ থাকে তা পূর্ণ এক বৎসর জমা থাকিলে উহার ২$\frac{1}{2}$% গরীব মিসকিনকে দান করাকে যাকাত বলে। তাই শুধুমাত্র বিত্তশালীদের উপর যাকাত ফরয। যাকাত দেওয়ার ফলে যাকাত দাতার মাল কমে না বরং বৃদ্ধি পায়, এবং তার অন্তর কৃপণতার কলুষ হতে পবিত্রতা লাভ করে। রাষ্ট্রের দুস্থ জনসাধারনের সাহায্যের জন্য যাকাত ব্যবস্থা ইসলামের আসল উদ্দেশ্য নহে। মানুষের নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন করায় ইসলামের উদ্দেশ্য। যাতে মানুষ আপন বিবেকের তাড়নায় এই দায়িত্ব অনুভব করে এবং দুস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসে। তাই কোরানে আল্লাহ ঘোষণা করেন—"হে মোমিনগন! আমি যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে তোমরা দান কর, সেই দিন আসিবার পূর্বে যেই দিন থাকিবে না কোন ক্রয়বিক্রয়, না কোন বন্ধুত্ব, আর না কোন সুপারিশ।" যাকাত—যাকাত আদায়কারীর মধ্যে আত্মোৎসর্গ নীতির বিকাশ সাধন করে এবং তাদেরকে স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার উর্ধে উন্নীত করে। অর্থ মানব জীবনের অপরিহার্য বস্তু সত্য; তবে ইহা জীবনের উদ্দেশ্য নহে। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল চারিত্রিক উন্নতি ও পরকালে শান্তি। 'পথিকের পাথেয় তার জন্য অপরিহার্য; কিন্তু তা তার উদ্দেশ্য নহে।' ইহাই যাকাতের শিক্ষা ও তাৎপর্য।

মককা নগরীতে অবস্থিত পবিত্র কাবাঘর দর্শন লাভের উদ্দেশ্যে তথায় পৌঁছিয়া মহিমান্বিত আল্লার উপর একান্তভাবে আত্মসমর্পন করে একাগ্রচিত্তে নানাবিধ আনুষ্ঠানিক ইবাদত করাকেই হজ্জ বলে। বিত্তশালী মুসলমানের উপর জীবনে একবার হজ্জ করা অপরিহার্য কর্তব্য।

হজ্জ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উন্নতি সাধন করে তার অন্তরে পারলৌকিক সুখের অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। একই খোদা, একই কাবা এবং একই রসূলের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের ভাব জেগে উঠে। একই পোষাকে ভূষিত হয়ে একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং একই খোদাকে সম্বোধন করে তারা সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়। হজ্জ মানুষকে একইভাবে চিন্তা করতে এবং একইভাবে কার্য ও বসবাস করতে শিক্ষা দেয়। তাই হজ্জের গুরুত্ব অনুধাবন করে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন—"একমাত্র ইসলামী জীবনবিধানই ইহার অনুসারীদের মধ্যে জাতি বা বর্ণ বৈষম্য দূর করিতে সবচেয়ে বেশী কৃতকার্য হইয়াছে।"

রাজনৈতিক দিক দিয়াও হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। সারা বিশ্বের মুসলিমগণ হজ্জ উপলক্ষে একত্রিত হয়ে তাদের জাতিয় বা দলীয় স্বার্থের উর্ধে উঠে একে অন্যকে ভ্রাতৃত্ব ভাবে আলিঙ্গন করে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে একই স্থানে জমায়েত হয়ে তারা বুঝতে পারেন যে, মুসলমান হিসাবে তারা পৃথিবীতে এক স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ জাতি, যার মহান দিশারী হল একই খোদা, একই রসূল এবং একই কাবা।

তুতুং

প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা
একাদশ বিজ্ঞান
স্কুল নং ২৬১৫

গ্রামের নাম তৈকুসুম্, ওই দুরের নীল নীল পাহাড় থেকে নেমে আসা ছোট্ট ঝর্ণা একটা, যেটা গ্রামের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে, তারও নাম তৈকুসুম। তৈ বলতে ঝর্ণা আর কুসুম্ বলতে কালো বুঝায়। কিন্তু ঝর্ণার জল কালোও নয়, সবুজও নয়, নীলও নয়। কাঁচের মত স্বচ্ছ, রূপোর মত ঝক্‌ঝকে। থির্ থির্ করে কাঁপে ঝির্‌ঝির্ করে বয়ে যায়। তার ঝুম্‌ঝুম্ ধ্বনি নিঝুম প্রকৃতিকে ভরে রাখে।

সেই ঝর্ণার তীরেই তুতুংদের বাড়ী। যখন তৈকুসুম্ গ্রামের কথা কেউ বলে, আমার চট্ করে মনে পড়ে যায় তুতুং আর ঝর্ণাটাকেই।

যুদ্ধের বছর পালিয়ে গিয়েছিলাম তৈকুসুম্ গ্রামে। পাহাড়ে গ্রাম। সেখানেই তুতুং-এর সাথে পরিচয়, বন্ধুত্ব। পুষ্ট গড়ন, ফর্সা বরণ। তার গোল গোল চোখ দুটোয় সব সময় নানান্ জিজ্ঞাসা।

কতই বা হবে বয়েস, আমি ছিলাম এগার কি বার, সে ছিল আমার চেয়েও বছর তিনেকের ছোট। কিন্তু বয়েসে ছোট হলে কি হবে নানান্ কাজে সে ছিল আমার বা আমার ভাইদের চেয়েও অনেক পটু। পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠা নামা করা, গাছ-গাছালির নাম বলে দেয়া, খেলা প্রভৃতিতে আমাদের অনাড়ীপণা দেখে সে হাসত, মজা পেত। আর ওই টুকুন বয়েসেই যখন সে ঝুম্‌ঝাম্ করে দাংদু বাজাত, আর খুব মিষ্টি সুরে বাঁশি বাজাত, আমার খুব দুঃখ হত নিজের কথা ভেবে।

আমি তাই শোধ নিতাম দেশ-বিদেশের নানান্ কথা বলে। সেই বয়েসে বইটই থেকে জানা আর বড়দের কাছে শোনা কোন কথাই বাদ দিতাম না তাকে বলতে। শুনে সে অবাক হত, তার গোল গোল চোখ দুটোয় নানান্ জিজ্ঞাসা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলত। জিগ্যেস করত, 'আচ্ছা! কি যেন নাম, ওরা যে চাঁদে গেল, সেই চাঁদবুড়ীটাকে নিশ্চয় দেখেছিল? আর সেই বটগাছটার ছায়াতেও নিশ্চয় বসেছিল?----??' এমন তর হাজারো প্রশ্ন সে করত, আর আমিও যতটুকুন সাধ্য, নিজেও যে কম জানি তা তাকে জানতে না দিয়ে, বিজ্ঞের মত হাত মুখ নেড়ে তার প্রশ্নের জবাব দিতাম।

তুতুং খুব সুন্দর করে বুড়োবুড়ী আর মায়ের কাছে শোনা রূপকথার গল্পগুলো গুছিয়ে, মধুর ভঙ্গীতে বলতে পারত। তার দিদিও নাকি খুব সুন্দর করে গল্প বলতে পারত। তুতুং তার দিদির কথা প্রায়ই বলত, আর তখন সে কেমন যেন বিষন্ন, উদাস উদাস হয়ে পড়ত। ওই ছোট্ট বয়েসেই তার মনে জমাট বেঁধে ছিল কান্নাভেজা অনেক দুঃখ, দিদির স্মৃতি।

আমাকে জিগ্যেস করত, 'কত পূজো দিয়েছি আমরা দিদির জন্য, কিন্তু দেবতাগুলো এত নির্দয় কেন? কেন তারা আমার ববইকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?' আমার মনটাও তখন তার প্রিয় ববই-এর জন্য হাহাকার করে উঠত। বলতাম, 'অসুখ হলে আমরা পূজো দিইনে, ডাক্তার দেখাই। দেবতা টেবতা আসলে কিছুই না, মানুষের কল্পনা-মাত্র।' তার ছোট কাল থেকে জেনে আসা সংস্কারগুলো সন্দেহের দোলায় দুলত। 'সত্যিইতো, কেউতো চোখে দেখেনি দেবতা-টেবতা!---এইতো, গেল ভাদরে সবুজ সবুজ জুমক্ষেতগুলো যখন সোনায় সোনায় ভরে গিয়েছিল, যখন ঘরে ঘরে ঢেঁকির গুরু গুরু আওয়াজ উঠেছিল, তখনই মারা গেল তনবি'র মত অমন ছোট্ট, মিষ্টি মেয়েটা।---বিষু উৎসব শেষ হতে না হতেই মারা গিয়েছিল কালাফা'র সৎ, জোয়ান ছেলেটা, যে জ্যোৎস্না রাতে বাঁশি বাজিয়ে মেয়েদের কাঁদাত, ছেলেদের উদাস উদাস করে দিত, আর বুড়োবুড়ীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেত তাদের ছেলেবেলায়।---তারাতো কারো ক্ষতি করেনি!---তাদের আরোগ্যের জন্য পূজোও তো দেয়া হয়েছিল অনেক!---'

তুতুং আমাকে হঠাৎ জিগ্যেস করেছিল, 'আচ্ছা, আমি কি ডাক্তার হতে পারব?' 'নিশ্চয়।'—আমি বলেছিলাম। তার গোল গোল চোখ দুটো কিসের এক জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। 'আর তার জন্য তোমাকে ভালো করে লেখাপড়া করতে হবে।' আমি বলেছিলাম, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল, সে লেখাপড়া করে না, বর্ণ-পরিচয়ও জানে না। গ্রামটায় বা কাছাকাছি কোন স্কুল ছিল না। তার মা-বাবাও তাকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে পড়াবেন না। সে আমার দিকে তাকিয়েছিল কেমন অসহায়ের দৃষ্টিতে। তার চোখে কি এক রুদ্ধ ব্যথা, কি এক অভিযোগ টলটল করতে দেখেছিলাম।

আমার খুব খারাপ লেগেছিল সেদিন।

আনন্দ বেদনার মাঝে তৈকুসুমের দিনগুলো কাটছিল। যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের ছোটদের কোন মাথা ব্যথাই ছিল না। আমরা ছেলেমেয়ে সবাই দলবেঁধে যেতাম জুমক্ষেত গুলোতে। টিয়ে পাখির ঝাঁক ক্ষেতের ফসল খেতে আসলে হৈ চৈ করে তাড়াতাম। যেদিকে চোখ যায় সবুজ সবুজ জুমক্ষেত, যেন নরোম সবুজ কোন কিছু দিয়ে মোড়া অনেকগুলো পাহাড়। ধান গাছগুলো বাতাসে দুলত, তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে লতানো থাকতো শসা, ঝিঙে, কুমড়োর গাছ। কার্পাস তুলো ফুটে থাকত এখানে ওখানে। যেন সবুজ আকাশে সাদা সাদা তারারা আছে ফুটে। ছেলেমেয়ে সবাই গান ধরত ঃ—

সবুজ বনে ফলছে সোনা
সোনাতো আর যায়না গোনা
ঢেঁকির শব্দ গুরু গুরু
ঘরে ঘরে হচ্ছে শুরু---।

একদিন যুদ্ধ থেমে গেল।

এক কুয়াশা-ঢাকা শীতের সকালে আমরা চলে এলাম তৈকুসুম্ ছেড়ে। বিদায় বেলায় মা কেঁদেছিল, গ্রামের মেয়েরা কেঁদেছিল, আমার আর আমার ভাইদের চোখে ছলছল করছিল বিদায়ের ব্যথা। তুতুং কেমন মায়াভরা চোখে তাকিয়েছিল, ইচ্ছে করেছিল কেঁদে উঠতে, পারলে তুতুংকে সঙ্গে আনতাম সেদিন, এমনকি গোটা গ্রামটাকেই।

সেই স্বচ্ছ ঝর্ণা, নীল সবুজ পাহাড়গুলো, ছোট ছোট মাচার ঘর, আর সহজ সরল মানুষগুলো চোখের জলে আর ঘন কুয়াশায় ঝাপ্সা হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে গেল পেছনের দৃষ্টিপথে। আমার শুধু মনে হচ্ছিল, কি যেন রেখে এলাম, কি যেন ফেলে গেলাম।

এরপর চার-পাঁচ বছর কেটে গেছে। আমি স্কুলজীবন শেষ করেছি। তৈকুসুম্ গ্রাম হাতছানি দিয়ে ডাকলো আমাকে।

সময়টা বোশেখ মাস। আনন্দময় বিষু উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই সবাই নেমেছে জুমচাষের কাজে। পোড় দেওয়া কালো কালো পাহাড়গুলোতে ছেলেমেয়ে, ছোটবড় সবাই কাজ করছে। তাদের একজন হিসেবেই এবার তুতুংকে পেলাম। দেখলাম, জীবন সংগ্রামের কিছুটা রুক্ষ ছাপ পড়েছে চোখে মুখে। আগের সেই উচ্ছ্বলতায় গোল গোল চোখের উজ্জ্বলতায় কিছুটা যেন কম্‌তি দেখলাম। গায়ের রঙও রোদেপুড়ে তামাটে হয়ে গেছে।

আমাকে দেখে কিছুটা অবাক হল, তারপর যেন মহামূল্য কিছু একটা পেয়েছে এমনভাবে হৈ চৈ তুলল। চেঁচিয়ে উঠল, 'কত বদলে গেছে তাতা-পুতুং!' সবাইকে—বলল,-- 'কি আশ্চর্য তাই না?'—যেন ভীষন অবাক-করা কাণ্ড একটা ঘটে গেছে। অথচ কত বদলে গেছে তারাও!

অনেক অভিযোগ তার, এতদিনে বুঝি তুতুংকে মনে পড়ল, লেখাপড়া করলে বুঝি তুতুংকে মনে রাখা যায় না, ইত্যাদি।

দেখলাম, অজ্ঞানতার আলো-আঁধারি, দুঃখ-দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের মাঝেও তৈকুসুমের সেই সহজ সরল উচ্ছলরূপ হারিয়ে যায়নি। জ্যোৎস্না রাতে এখনো বাঁশির তুরু তুরু মিষ্টি সুর ভেসে বেড়ায় সবুজ থেকে নীল নীল পাহাড়ে, যা শুনে মনটা কেমন আন্‌চান্ করে উঠে। ভোর রাতে এখনো সবাই হৈ চৈ করে জুমক্ষেতে যায় কাজ করতে। বৈশাখের রুদ্ররূপ, রুক্ষ মূর্তিকে উপেক্ষা করে তিলে তিলে সবাই গড়ে তুলে জুমক্ষেত। কালো কালো পোড়া পাহাড়গুলো একদিন ভরে উঠবে সবুজের সমারোহে। আসবে পাকা ফসলের সোনালী দিনগুলো, ঘরে ঘরে ঢেঁকির গুরু গুরু আওয়াজ, দাংদুর ঝুম্‌ঝাম্, বাঁশির তুরু-তুরুরুরু--।

তৈকুসুম গ্রামে যে কদিন ছিলাম, মনে হয়েছিল, বাইরে সভ্য পৃথিবী বলতে কিছু নেই—শুধু এই গ্রামটাই আছে, ছিল, চিরকাল থাকবে—।

চলে আসার সময় মনটা আগের মতই কি যেন একটা রয়ে যাওয়ার ব্যথায় হু হু করে উঠেছিল। তুতুং বলেছিল, 'তাতা-পুতুং, নাওক্‌সে চিনি মাখাং সুজানায়—তোমরাই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে---।' তার কথা কেমন যেন অসম্পূর্ণ মনে হল, একটু যেন ভিজে ভিজে তার গলা। চোখে তার কেমন অদ্ভুত দৃষ্টি ছিল সেদিন। অভিযোগ, আক্ষেপ, ব্যথা---কি যে তার চোখে ছিল তা আজও বুঝতে পারি না আমি। সে কি বলতে চেয়েছিল যে সেও একদিন ডাক্তার হওয়ার কথা, বড় হওয়ার কথা বলেছিল? তার সেই সোনালী স্বপ্ন রঙিন শৈশবকে হারাতে হয়েছে আরণ্য প্রকৃতির গহীন বুকে। তাই বুঝিবা তার চোখের ভাষায় কার বিরুদ্ধে যেন অভিযোগ।

আমার স্মৃতি পটে হয়তো একদিন তুতুংএর মুখটা ঝাপ্‌সা হয়ে আসবে অনেক স্মৃতির ভিড়ে হয়তো হারিয়েই যাবে। কিন্তু তার উদাস উদাস বিষন্ন চোখের সেই অদ্ভুত দৃষ্টি আমার চিরদিন মন থাকবে। আর 'তাতা পুতুং নাওক্‌সে চিনি মাখাং সুজানায়--।' তার সেই ভিজে ভিজে গলার আবেদনটাকে কোনদিন ভুলবো না। ভুলবো না।

তিনটি কবিতা

মোঃ শহিদুল ইসলাম
৭ম শ্রেণী
স্কুল নং ২৪৫২

কাকের ডাক

কা—কা
    কাকটা
ঘা-ঘা লাগছে, ডাকটা
এই কাক ভাগ,
    করলাম তাক।
যা-যা—উড়ে,
উড়ে যা দূরে।
কাকটা ঐ উড়ছে
আকাশটা ঘুরছে।
ডাকছে আবার কা
    কানে লাগছে ঘা।

চলো লেখা-পড়া করি

লেখাপড়া করে যেই,
বেশী জ্ঞান পাবে সেই।
লেখাপড়া কর যদি,
খেতে পাবে ছানা দধি॥

ভুবন জুড়ে

থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে,
ঘুরবো মোরা ভুবনজুড়ে।
দেখব চাষী কেমন করে,
ফলছে ফসল সোনার ক্ষেতে।
আমরা তরুণ পাশে আছি,
খুলবো এবার চাষীর হাসি।

হে জননী জন্মভূমি

সুলতান আহমদ
একাদশ বিজ্ঞান
স্কুল নং ২৬২৯

(মাতৃ-রূপী চির সবুজ আমার
সেই শৈশবের ক্রীড়াভূমিকে—)

শত সূর্যোদয়-পরে এসেছি ফিরে
চির-সুন্দর তব স্নেহ-ক্রোড়ে,
চির হাসি তব,—চির কলতান,
হরিয়াছে মম উতলা পরান,
হৃদয়ের তব ছন্দ-নটন,
বহিছে আমার হৃদয় জুড়ে।

কত কল্পনা, কত হাসি-গান,
মধু-নন্দিত ফাগুন চেতন,
চরণের তব নুপুর-গীতি,
অম্লান তব চির স্নেহ-প্রীতি,—
কাকলী-কেকায় মাধুরী মেশায়ে—
জাগায়েছে মম সুরের স্বপন।

নৃত্য-দোদুল ছন্দের তালে,
শিহরিছে মোরে মধু হিল্লোলে,
দখিনা ফাগের রঙিন পাখায়,
কুসুম দলের আঁখি ইশারায়;—
ঝলমল তব সুরভি মায়ায়,—
হৃদয় আমার নিতুই দোলে।

স্নিগ্ধ-ছায়ায়, অশথের তলে,—
তটিনীর তলে, বটের মূলে,—
আবার যবে আসিব ফিরে,
সুধা ভরা তব প্রশান্ত নীরে,
দেখিব তোমারে হেন অনুরাগে,
বাসনা মম আশার ছলে।

রোযার তাৎপর্য

সাইফুর রহমান
দশম বিজ্ঞান
স্কুল নং ১০৬১

রোযা আরবী শব্দ "ছাওম"-এর প্রতিধ্বনিমাত্র। যার অভিধানিক অর্থ কোন কাজ থেকে বিরত থাকা। ইসলামী মতে "সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হতে বিরত থাকার নামই রোযা।" রোযা দীন ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। প্রতিষ্ঠানিক ইবাদত হিসেবে রমজানের চন্দ্রমাসের পূর্ণ ১ মাস রোযা রাখা ফরয।

ধর্মীয় তাৎপর্য ঃ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রোযা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অত্যন্ত সহজ ও নির্ভরযোগ্য খেয়াতরণী। আল্লাহ্‌ মোত্তাকীগণকে ভালবাসেন, তাই বান্দার ভালবাসার প্রতিদান দেবার অভিপ্রায় পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন "ওহে বিশ্বাসীগণ তোমাদের ওপর রোযা অবধারিত করা হয়েছে যাতে তোমরা মোত্তাকী হতে পার"।

আত্মসংযম ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই রোযার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই মুসলমানদের মধ্যে সংযম সাধনা, আত্মশুদ্ধি, সাম্য, সহানুভূতি ও মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটানই রোযার মূল উদ্দেশ্য। আত্মশুদ্ধি ব্যতিত যেমন খোদার নৈকট্য লাভ করা যায় না, তেমনি আত্মকামনা পরিত্যাগ করতে না পারলেও আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়। রোযা মানুষকে কামনা, অসৎ বাসনা ও লোভ থেকে মুক্ত করে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে "যারা বিপুগুলো দমন করে খাঁটি পথে অটল থাকবে তাদেরকে অগণিত পুরস্কার দেয়া হবে।" হযরত (সঃ) বলেছেন "রোযা হচ্ছে সকল ইবাদতের প্রবেশদ্বার।" কারণ রোযা ইবাদতের সকল প্রতিবন্ধক যথা লোভ, কামনা বাসনাকে দমন রেখে আত্মাকে পবিত্র রাখে। হাদীছে উল্লেখ আছে "রোযা শয়তানের দুষ্টমি ও দোযখের আগুন হতে রক্ষা পাবার ঢাল স্বরূপ।"

আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ঃ মুসলমানদের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিধান হিসেবেই রোযার প্রচলন। রমযান মাসে সারা মুসলিম জাহান পূণ্যের মহিমাময় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। কলেমার সুর, আযানের ধ্বনি, তেলাওতে কুর্‌আন দিকবিদিক মুখরিত করে তোলে। বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রাণ পূণ্যের আভায় ভরে ওঠে। ঐশী প্রেম ও পরকালের সুখলাভের আশা তাকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে থাকে। তাই সে দিবারাত্র ইবাদত করেও ক্লান্তি বোধ করেনা। বরং অধিক পূণ্যের আশায় সবেকদরের রাত্রির সুখনিদ্রা পর্যন্ত ত্যাগ করে।

সামাজিক তাৎপর্য ঃ সমাজিক ভারসাম্য এবং সামাজিক বন্ধনের ক্ষেত্রেও রোযা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নামাজ, সেহেরী এবং ইফতারের পর পরস্পরের সহযোগীতা এবং মিলন পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সারাদিন উপবাসের

পরে ধনী, গরীবের ক্ষুধার তাড়না উপলব্ধি করতে পারে। ফলে ধনী দরিদ্রের সম্মিলিত জামাত পরস্পরের সাথে সামাজিক দূরত্ব কমিয়ে আনে।

কষ্ট সহিষ্ণুতা ও দায়িত্ববোধ : রোযার উপবাস মানুষকে যে শুধু ক্ষুধাসহিষ্ণু করে তোলে তা নয়। ক্ষুধার সাথে সাথে সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাত সম্পর্কেও সে সহিষ্ণু হয়ে ওঠে। উপবাসের মাধ্যমে দুর্বল করে বন্য পশুকে যেমন সহজে বশে আনা যায়। তেমনি রোযা মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পাপী আত্মাকে দুর্বল করে মনের পাশবিক প্রবৃত্তি দূর করে আত্মাকে তেজদীপ্ত উজ্জ্বল ও শক্তিশালী করে তোলে। তাই মানুষ তার রিপুর ওপর হারান নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ফিরে পেয়ে মনকে আত্মকেন্দ্রিক থেকে খোদা কেন্দ্রিক এবং সমাজকেন্দ্রিক রূপে গড়ে তুলতে পারে। ফলে সে অচিরেই আল্লাহ্ তথা সমাজের প্রতি দায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে উঠে।

শারীরিক তাৎপর্য : হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন "রোযা রাখ স্বাস্থ্য ভাল থাকবে" (আল হাদিছ)। মনের সাথে শরীরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই রোযা মানুষের মনকে পবিত্র করে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। সারাদিন রোযা রাখলে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় ও পরিপাকতন্ত্রের শক্তি বাড়ে। এবং মেদবহুল মানুষের হৃৎপিণ্ড, ধমনী ও শীরায় জমাচর্বি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ডাঃ ডিউই বলেছেন, "রোগীর উদর হতে খাদ্য সরিয়ে ফেল, তাতে রোগীর অনশন হবে না, রোগেরই অনশন হবে।"

নৈতিক তাৎপর্য : রোযার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও অসমাজিক কার্য-কলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রয়েছে। যা মুসলমানদেরকে নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করে থাকে।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য : ধুমপায়ী অন্যান্য নেশাগ্রস্থ মানুষ রোযার বদৌলতে বাজে খরচের হাত থেকে রেহাই পেয়ে থাকে। তাছাড়া রোযার সময়ে ফিতরা এবং যাকাত ধনী ও দরিদ্রের মাঝে সমতা আনয়নে সহায়ক।

কাজেই রোযা মুসলমানকে দিয়েছে মুত্তাকির সম্মান, দরিদ্রকে দিয়েছে ধনীর সম-মর্যাদা, মানুষে মানুষে বিভেদ কমিয়ে ইহকাল ও পরকালের জন্য দিয়েছে অনাবিল শান্তি। তাই কবি শেখ সাইফুল্লাহ্ গেয়েছেন--

রমজান নহে শুধু উপবাস থাকা
আত্মার মহা অভিযান
তনুময় সংযমে রহে অতি বাঁকা
মনঃপূত মিলে প্রতিদান॥

●

একটু হাসো

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
পঞ্চম শ্রেণী
স্কুল নং ১৮১০

একটা স্টেশনে ট্রেন থামলে একজন মোটা ভদ্রলোক তার সহযাত্রী একজন রোগা ভদ্রলোকের দুই কাঁধের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, 'এই যে ভাই, বলতে পারেন এটা কোন স্টেশন ?

জবাবে লোকটা পিঁ পিঁ করে, 'বলল জ্বী না জনাব, এটা কোন স্টেশন নয়, এটা আমার কাঁধ।'

(২)

শিক্ষক : বলতো রহিম, কাল কয় প্রকার ?

রহিম : কাল তিন প্রকার। যথা অতীত কাল, বর্তমান কাল ও ভবিষ্যৎ কাল।

শিক্ষক : হাবীব, রহিমের জবাব কি ঠিক হয়েছে ?

হাবীব : জ্বী না স্যার। ও আরো দুটো কালের কথা বলেনি। সকাল ও বিকাল।

শিক্ষক : (হেসে) তাইত ! তবে তোমারও উত্তর সঠিক হয়নি। ইহকাল ও পরকালের কথা কে বলবে শুনি ?

(৩)

কোন এক মস্‌জিদে প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে তেল রাখা হ'ত। একটি লোক সাধু বেশে এসে প্রায়ই ঐ তেল চুরি করতো। আসলে ঐ ব্যক্তির ধারনা ছিল—মসজিদতো আল্লাহর ঘর। আর তেল তাওতো আল্লাহ্‌রই এবং সেও আল্লাহ্‌র বান্দা। সুতরাং মস্‌জিদের তেল নেয়ায় কোন দোষ নেই।

মসজিদের খাদেম রক্ষিত পাত্রে তেল না পেয়ে পেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে চোর ধরার জন্য ওৎ পেতে থাকলো। সে দেখ্‌তে পেল একটি লোক মসজিদে ঢুকে বলতে লাগলো "আল মাসজিদু বাইতুল্লাহ। আল্‌ যাইতু, যাইতুল্লাহ, আনা আবদুল্লাহ। ফা আখায্‌তু বি-বিস্‌মিল্লাহ'। অর্থাৎ মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর, তেলও আল্লাহ্‌র। আমিতো আল্লাহ্‌রই বান্দা, সুতরাং আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই তেল নিলুম।

এই বলে পাত্র হতে তেল ঢেলে নিল, মস্‌জিদের খাদেম ধৈর্য ও কৌতূহলের সাথে ঘটনাটি অবলোকন করলো। পরবর্তী দিন খাদেম সাহেব উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য পূর্ব

হতেই ডাণ্ডা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। উক্ত চোরটি তার উল্লেখিত মন্তব্য শেষ করে যেমনি "বিসমিল্লাহ্" বলে পাত্র হতে তেল ঢালতে শুরু করলো অমনি মসজিদের খাদেম ডাণ্ডা উঁচিয়ে আল্ "যরবু, যরবুল্লাহ" অর্থাৎ এ প্রহারও আল্লাহ্রই, বলে বেদম মার শুরু করল।

(৪)

গাছে বসে একটি মোটা তাজা মোরগ ডাক ছিল। তা' দেখে এক শিয়ালের খুব লোভ হ'ল। সে গাছের নীচে গিয়ে বল্ল্—"মুয়াজ্জেন সাহেব আপনার আজান শুনে আমি এসেছি, নীচে নেমে আসুন জামাতে নামাজ পড়ি"। মোরগটি বল্ল "আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন, কারণ ইমাম সাহেবের এখনও ঘুম ভাংগেনি তিনি ঐ গাছের আড়ালে ঘুমুচ্ছেন।" শিয়াল উঁকি দিয়ে দেখল —একটি মোটা তাজা কুকুর ঘুমুচ্ছে। সে অমনি পালাতে শুরু করলো, মোরগ বল্ল, "যাচ্ছেন কেন জামাতে নামাজ পড়বেন না?" শিয়াল বলল, "আমার অজু ভেংগে গেছে, অজু করে আসি।"

"বিদ্বানের কালি শহিদী-রক্তের চেয়েও বেশী পবিত্র।"

—আল-হাদীস

যোজ্যতা

মোঃ মাসুদুর রহমান
দ্বাদশ বিজ্ঞান
স্কুল নং ২৪৮৯

কে, এনএ, আই, কপার আস
সি এল, এইচ টু, মারকিউরাস
ও এইচ গ্রুপ আর এল আই, এজী
নাইট্রেট, বাইকার্বনেট হয় একযোজী।

দুই যোজনী এদের নাম--
জিংক, কপার (ইক) ক্যালসিয়াম।
এমজি, ফেরাস, ও, মারকিউরিক
দ্বিযোজী হয় জান ঠিক।
বিএ, পিবি (আস), কার্বনেট
দুই যোজী হয় সালফেট।

এ ইউ, এন, পি, এন্টিমনি
আর এ এল, আয়রন (ইক) হয় তিন যোজনী।

এস, এস এন (ইক) সিলিকন
চার যোজী হয় কার্বন।

তিন, পাঁচ যোজী এসবি, এন,পি,আর
দুই, চার. ছয় হয় সালফার।

ড্যাফোডিল

(অনুবাদ কবিতা)
মূল ঃ রবার্ট হেরিক

বিরূপাক্ষ পাল
একাদশ মানবিক
স্কুল নং ২৬০৯

ওহে সুন্দর ড্যাফোডিল,—
হৃদয় আমার উঠিল কাঁদিয়া,
এত ত্বরা কেনে যাও গো চলিয়া ?
এখনো অরুণ পড়েনি হেলিয়া পশ্চিম গগনেতে,
রহো, তুমি রহো, আরো কিছুক্ষণ,
দ্রুতগামী দিবা করুক গমণ,
সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা শেষে একত্রে একপথে,
তোমার সাথে ধাইবো মোরা মিলে মিশে একসাথে।

মোদেরও রয়েছে ক্ষুদ্রজীবন,
ক্ষুদ্র মোদেরও বসন্ত-ক্ষণ,
দ্রুত-বর্দ্ধনে মোদের জীবন ধ্বংসের মুখে চলে,
যেমনি কয়েক ঘণ্টার গতি,
তোমার জীবনে ঘটাইবে ইতি,—
তোমারি মতন আমরাও পড়িব মরণ-ক্রোড়ে ঢলে,
গ্রীষ্ম-ধারা যেমনি হারায়,—একবার শুকোলে।
অথবা যেমনি প্রভাতের কণা,
ঝলমলো যেন মুক্তোর দানা,
প্রভাতে দেখায় অপরূপ প্রায়—প্রভাত বিদায় নিলে,
আবার তাকে যাবে না'কো দেখা একবার লুকাইলে।

খেলাধূলা

নূর মোহাম্মদ
দশম মানবিক
স্কুল নং ১০৪৬

খেলাধূলা করলে যে স্বাস্থ্য ভাল থাকে একথাটা পুরাতন ও সত্য। কিন্তু শুধু দেহের পেশীগুলি সুগঠিত করাই যদি খেলাধূলার আসল উদ্দেশ্য হত, তা' হলে খেলোয়াড়রা খেলায় না যেতে এবং দর্শকগণ খেলা দেখতে না গিয়ে ছাদের কোণে ডন-বৈঠক আরম্ভ করত। দেহ রক্ষার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, মনের খোরাকের জন্যও তেমনি প্রয়োজন আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূলা। এদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বিদ্যালয় ছাত্রদের সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনের অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক গুণ অর্জনের অন্যতমপথ হিসাবে খেলাধূলার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। তাই তো বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র বিকালের খেলাটুকুর আশায় ক্লাশের শক্ত পাঠগুলো অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শেষ করে থাকে। বিদ্যালয়ের ৫টি ছাত্রাবাসে বা হাউসের জন্য ৪ জন অভিজ্ঞ শারীরিক শিক্ষাবিদ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মর্নিং পিটি, কাবিং, স্কাউটিং, রেডক্রস, ব্যাণ্ড এবং বৈকালিক বাধ্যতামূলক খেলাধূলার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

প্রতি বছর দারুণ উৎসাহ ও বিপুল উত্তেজনার মধ্যে আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আউটডোর ও ইনডোর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন খেলার ফলাফল, ১৯৭৮

বহিঃক্রীড়া প্রতিযোগিতা--(Outdoor)
(ছোটদের শাখা)

খেলার বিষয়	অবস্থান	হাউস
আন্তঃহাউস ভলিবল	চ্যাম্পিয়ন	২নং হাউস
	রানার্স আপ	১নং হাউস
আন্তঃহাউস বাসকেট বল	চ্যাম্পিয়ন	২নং হাউস
	রানার্স আপ	১নং হাউস
আন্তঃহাউস ক্রিকেট	চ্যাম্পিয়ন	২নং হাউস
	রানার্স আপ	১নং হাউস

খেলার বিষয়	অবস্থান	হাউস
আন্তঃহাউস ফুটবল	উভয় হাউস সমান পয়েন্ট পেয়ে—ড্র করেছে।	
আন্তঃহাউস হকি	উভয় হাউস সমান পয়েন্ট পেয়ে--ড্র করেছে।	

(বড়দের শাখা)

আন্তঃহাউস ভলিবল	চ্যাম্পিয়ন	ফজলুল হক হাউস
	রানার্স আপ	নজরুল ইসলাম হাউস
আন্তঃহাউস বাসকেট বল	চ্যাম্পিয়ন	নজরুল ইসলাম হাউস
	রানার্স আপ	ফজলুল হক হাউস
আন্তঃহাউস ক্রিকেট	চ্যাম্পিয়ন	হাউস নং ৩
	রানার্স আপ	ফজলুল হক হাউস
আন্তঃহাউস ফুটবল	চ্যাম্পিয়ন	নজরুল ইসলাম হাউস
	রানার্স আপ	ফজলুল হক হাউস
আন্তঃহাউস হকি	চ্যাম্পিয়ন	নজরুল ইসলাম হাউস
	রানার্স আপ	ফজলুল হক হাউস

আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৯৭৮

(ছোটদের শাখা)

আন্তঃহাউস ক্যারম	চ্যাম্পিয়ন	২নং হাউস
	রানার্স আপ	১নং হাউস
আন্তঃহাউস দাবা	চ্যাম্পিয়ন	১নং হাউস
	রানার্স আপ	২নং হাউস
আন্তঃহাউস টেবিল টেনিস	চ্যাম্পিয়ন	২নং হাউস
	রানার্স আপ	১নং হাউস

হাউস ভিত্তিক সেরা খেলোয়াড় ১৯৭৮ সাল

সেরা ক্যারম খেলোয়াড়	মাহবুবুল ইসলাম	১নং হাউস
সেরা দাবারু	সাইদুল হক	১নং হাউস
সেরা টেবিল টেনিস খেলোয়াড়	তারেক আহমেদ	১নং হাউস

আন্তঃকক্ষ কীড়া প্রতিযোগিতা—১৯৭৯ (Indoor games)

(বড়দের শাখা)

খেলার বিষয়	অবস্থান	হাউস
আন্তঃহাউস ক্যারম	চ্যাম্পিয়ন	ফজলুল হক হাউস
	রানার্স আপ	নজরুল ইসলাম হাউস
আন্তঃহাউস দাবা	চ্যাম্পিয়ন	ফজলুল হক হাউস
	রানার্স আপ	নজরুল ইসলাম হাউস
আন্তঃহাউস টেবিল টেনিস	চ্যাম্পিয়ন	ফজলুল হক হাউস
	রানার্স আপ	নজরুল ইসলাম হাউস

হাউস ভিত্তিক সেরা খেলোয়াড়, ১৯৭৮

সেরা ক্যারম খেলোয়াড়	মাহমুদুর রউফ	নজরুল হাউস
সেরা দাবারু	এ, কে, এম, ফারেজ	ফজলুল হক হাউস
সেরা টেবিল টেনিস খেলোয়াড়	সাব্বির আহসান	ফজলুল হক হাউস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন ১৯৭৮

ছোটদের শাখা (Junior wing)

গ্রুপ		বিজয়ী ও হাউসের নাম
গ্রুপ 'এ'	চ্যাম্পিয়ন	শহিদুল ইসলাম ২নং হাউস
গ্রুপ 'বি,	চ্যাম্পিয়ন	জাকিরুল ইসলাম ২নং হাউস
গ্রুপ 'সি'	চ্যাম্পিয়ন	নাজমুল আলম ২নং হাউস
গ্রুপ 'ডি'	চ্যাম্পিয়ন	আসাদুজ্জামান ২নং হাউস
গ্রুপ 'ই'	চ্যাম্পিয়ন	জাহিদ জামাল ২নং হাউস
গ্রুপ 'এফ'	চ্যাম্পিয়ন	কাজী সামাদ হোসেন ১নং হাউস

বড়দের শাখা (Senior wing)

গ্রুপ			বিজয়ী ও হাউসের নাম
জুনিয়র	চ্যাম্পিয়ন	আশরাফ তারিন	ফজলুল হক হাউস
ইন্টারমিডিয়েট	চ্যাম্পিয়ন	শেখ মোহাম্মদ নাসের, শওকত আলম ও তাজুল ইসলাম	ফজলুল হক হাউস
সিনিয়র	চ্যাম্পিয়ন	আফতাব মোল্লা	নজরুল ইসলাম হাউস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল ১৯৭৮

(হাউস ভিত্তিক)

ছোটদের শাখা	চ্যাম্পিয়ন	১৪৩ পয়েন্ট পেয়ে	২নং হাউস
	রানার্স আপ	৯১ পয়েন্ট পেয়ে	১নং হাউস
বড়দের শাখা	চ্যাম্পিয়ন	৭৫ পয়েন্ট পেয়ে	ফজলুল হক হাউস
	রানার্স আপ	৭০ পয়েন্ট পেয়ে	নজরুল ইসলাম হাউস

১৯৭৮-৭৯ সালে অন্যান্য স্কুল-কলেজের সাথে আমাদের স্কুলের খেলাধুলার ফলাফল ঃ--

খেলার বিষয়		
ফুটবল	ক্যাডেট কলেজ, ময়মনসিংহ বনাম রেসিডেন্‌সিয়াল মডেল স্কুল, ঢাকা	বিজয়ী
	রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, ঢাকা বনাম রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, কুমিল্লা	১--১ ড্র
ভলিবল	ক্যাডেট কলেজ, ময়মনসিংহ বনাম রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, ঢাকা	বিজয়ী
বাসকেট বল	রেসিডেনসিয়েল মডেল স্কুল. ঢাকা বনাম রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, কুমিল্লা	বিজয়ী

১ নং হাউস (ছাত্রাবাস)

হাউস মাষ্টার ঃ জনাব এম আমিনুল ইসলাম

হাউস টিউটর ঃ জনাব সৈয়দ মজহারুল ইসলাম

হাউস এলডার ঃ মাষ্টার মুস্তাক আহমেদ

হাউস প্রিফেক্ট ঃ মাষ্টার মোশারফ হোসেন

রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের যতগুলি ছাত্রাবাস আছে তার মধ্যে ১নং ছাত্রাবাসটি প্রাচীন। এই ছাত্রাবাসটি ১৯৬০ সালে স্থাপিত হয়।

পারিবারিক সম্পর্কের মাধুর্যময় আবেষ্টনী ছেড়ে ফুলের মত সুন্দর শিশুরা এখানে এসে নতুন বন্ধু পায় এবং তাদের সাথে মিলে মিশে নতুন জীবন আরম্ভ করে। এ ছাত্রাবাসে বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা ১৬৮ জন। তাদের বয়স ৬ বৎসর হতে ১২ বৎসর। এ বৎসর নবাগত ছাত্রাসংখ্যা ৫২ জন। এই ছাত্রাবাস হতে ৩১ জন ছাত্র বড়দের শাখায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

ফুলের কুঁড়ির মত সুন্দর শিশুরা শৈশবে আনন্দের দিনগুলি এখানে কাটিয়ে যখন কৈশোরে পদার্পণ করে তখন অনেককে এ ছাত্রাবাস ছেড়ে বড়দের শাখায় যেতে হয় তখন মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত অনেক মধুময় আনন্দমুখর স্মৃতি তাদের মানসপটে জেগে উঠে এবং বিদায় বেলায় বিষাদের ঘনছায়া চোখে ফুটে উঠে, তবুও তাদের যেতে হয়।

জীবনের মহত্তর লক্ষ্যের সাধনা নির্ভর করে সাধারণতঃ শান্তিময় পরিবেশের উপর। তাই এ ছাত্রাবাসটির চরম ও পরম লক্ষ্য সেই দিকে।

এই বিরাট ছাত্রাবাসটির বৈশিষ্ট্য হল এখানকার আবাসিক ছাত্রদের স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা। হাউস মাষ্টার ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করে ছাত্রদের মধ্য হতে একজন হাউস এলডার ও একজন হাউস প্রিফেকট সহ ৩৪ জন প্রিফেক্ট নিযুক্ত করেন। তাদের বিরাম-হীন শ্রান্তিহীন কর্মের মধ্য দিয়া প্রতিটি ছাত্রের চিত্তে আশা ও প্রাণে পরম উৎসাহ আসে।

প্রতি বৎসর একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রাবাসের ছাত্রদের উপস্থিতিতে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের শপথ গ্রহণ করে।

পাঠ-অনুশীলনকালে খাবার ঘরে, শোবার ঘরে, নামাজ ঘরে, বাগান ও মাঠে খেলা-ধূলায়, বৃক্ষরোপণ ও তার পরিচর্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে ছাত্রাবাসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রিফেক্টগণ ছাত্রদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে নিয়ম ও শৃংখলা রক্ষা করে থাকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম ও সহ পাঠ্যক্রম কার্যক্রম ছাত্রাবাসের অতীত ও বর্তমানের এক সুমহান গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

বিগত ১৯৭৮ সালের শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শাখায় এ ছাত্রাবাসের যে ছাত্ররা পাঠ্যক্রমে গৌরব অর্জন করেছে তারা হল--

স্কুল নং ২৩৬৬ সাঈদ রিয়াজ খান (২য় শ্রেণী), স্কুল নং ২৩৫৩ তৌহিদুল ইসলাম (২য় শ্রেণী), স্কুল নং ২২২২ জাভেদ হোসেন (৩য় শ্রেণী), স্কুল নং ২৫৫৬ আবু হোসেন ইমন (৩য় শ্রেণী), স্কুল নং ২৪০৬ তানভির কামাল (৪থ শ্রেণী), স্কুল নং ২৩৮৮ মাসুদ জামান (৪র্থ শ্রেণী), স্কুল নং ১৭৬১ মীর আরিফ উদ্দিন (৬ষ্ঠ শ্রেণী), স্কুল নং ২৬৫৯ রেজাউল হক (৬ষ্ঠ শ্রেণী), স্কুল নং ২০১৫ এ, কে, এম, তারেক (৭ম শ্রেণী)।

এ ছাত্রাবাসের ছাত্ররা বাগান পরিচর্যা, বক্তৃতা, অভিনয়, আবৃত্তি কাবিং, স্কাউটিং, আজান ও কেরাত প্রতিযোগিতা চারুকলা ও কারুকলা চর্চা, ব্যাণ্ড এবং দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশনা ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে পরম উৎসাহ নিয়ে থাকে।

বিগত ১৯৭৮ সালের শিক্ষাবর্ষে এ ছাত্রাবাসের যে ছাত্ররা খেলাধূলা, আজান, কেরাত ও বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের দাবিদার তাদের নাম--

আন্তঃহাউস খেলাধূলা প্রতিযোগিতা

স্কুল নং ১৮০৭ তারিখ আহমেদ (৫ম শ্রেণী) টেবিল টেনিস খেলায় শ্রেষ্ঠ।

স্কুল নং ২০৬২ মাহবুবুর রহমান (৬ষ্ঠ শ্রেণী) ক্যারাম খেলায় শ্রেষ্ঠ।

স্কুল নং ১৬৩৩ সাইদুল হক (৭ম শ্রেণী) দাবা খেলায় শ্রেষ্ঠ।

আন্তঃহাউস আজান ও কেরাত প্রতিযোগিতা

স্কুল নং ২২৫১ আলী হামিম মাদানী (৫ম শ্রেণী) আজানে শ্রেষ্ঠ

স্কুল নং ২৩৯৫ ইউসুফ কামাল (৪র্থ শ্রেণী) কেরাতে শ্রেষ্ঠ।

আন্তঃহাউস বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতা

স্কুল নং ১৬৯১ শাহ নেওয়াজ আলম (৭ম শ্রেণী)

স্কুল নং ১৮১৩ মোস্তাফিজুর রহমান (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

স্কুল নং ২০৫৮ এ, বি, সিদ্দিক (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

পরিশ্রম সহিষ্ণুতা অধ্যবসায় ও সাধনাকে সম্বল করে তারা সামনের দিনগুলোতে আর ও গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব অর্জনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আগামী দিনগুলিতে তাদের এ সংকল্প বাস্তবে রূপ নেবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

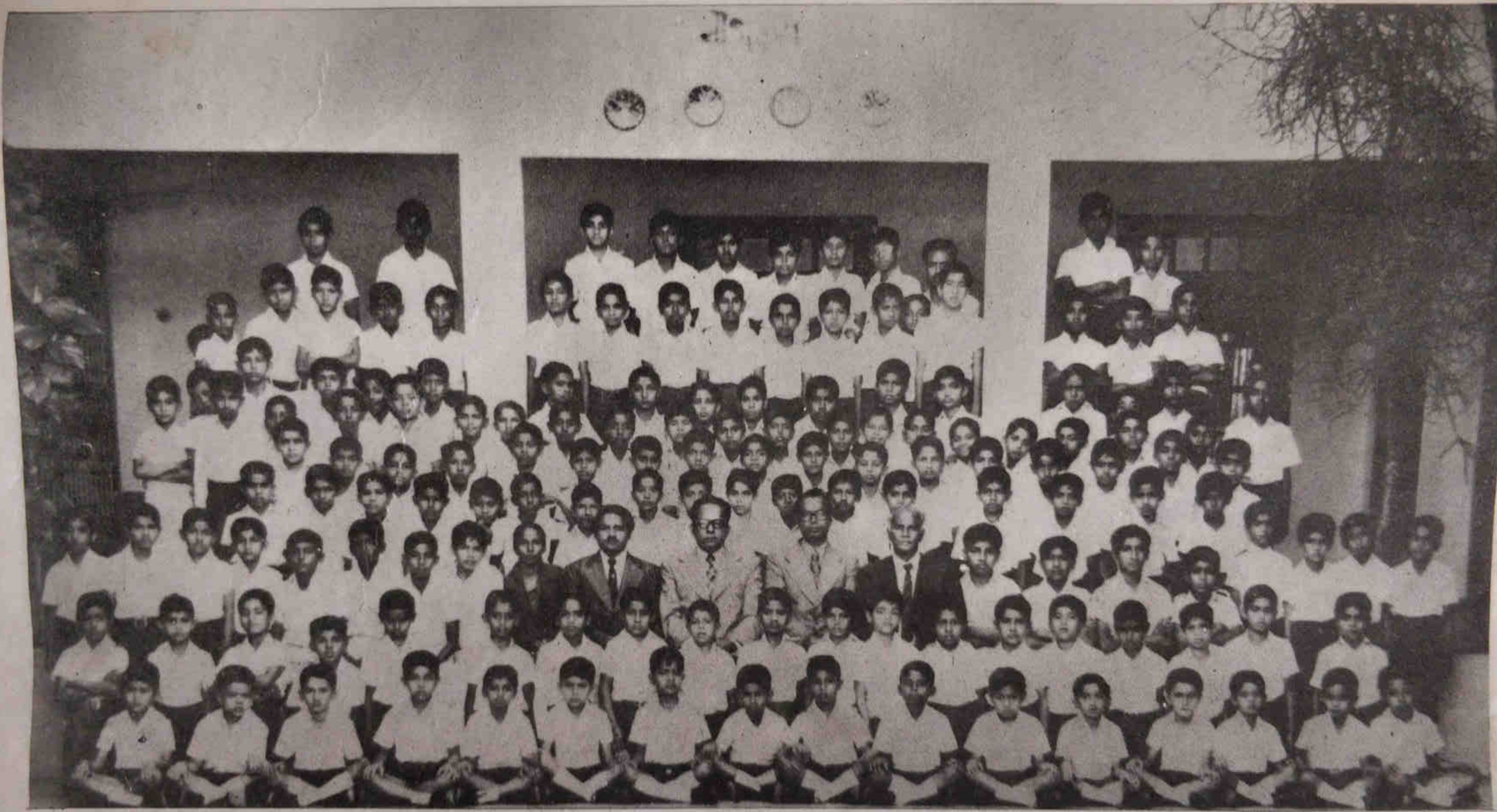

১ নং হাউস

২ নং হাউস

কোন একটি স্থির লক্ষ্যে পৌঁছবার পাকা সড়ক শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা। সেই জন্য আবাসিক ছাত্রদের ঐ বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয় এবং কর্ম-অনুরক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত করা হয়।

ইহা ছাড়া ছাত্রদের ধর্ম-বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় ও ধর্মীয় আচার অনুশীলনে উৎসাহিত করা হয় এবং দেহ মন ও আত্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

এ ছাত্রাবাসের ভেতরে ও বাহিরে এতদিন ধরে যে গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বের সুমহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার জন্য আত্মশ্লাঘা অনুভব করার অধিকার কোন একক ব্যক্তির নয় বরঞ্চ এ ছাত্রাবাসের হাউস মাষ্টার, হাউস টিউটর, থেকে শুরু করে ছাত্রবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

২নং হাউস (ছাত্রাবাস)

হাউস মাষ্টার ঃ জনাব আতাউল হক

হাউস টিউটর ঃ জনাব জালাল উদ্দিন

হাউস এলডার ঃ মাষ্টার ফেরদৌস খান (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

হাউস প্রিফেকট ঃ মাষ্টার মেহবুব হোসেন (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের ঐতিহ্যবাহী আবাসিক ভবন এই ২নং ছাত্রাবাস, যেটা সব সময় ছোট ছোট কচি কাঁচাদের কলকাকলীতে মুখর থাকে এবং যেটা এই স্কুলের কচি কাঁচাদের বহু গৌরব আর কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

১৩২ জন আবাসিক শিশু কিশোরদের (যাদের বয়স ৬ থেকে ১২ বছরের মধ্যে) বহুমুখী প্রতিভা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় এই পরিচ্ছন্ন ছোট্ট অথচ সুন্দর মনোরম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রাবাসটিতে। ১৯৬১ সনে ১লা মে এই ছাত্রাবাসটির জন্মদিন আর তারপর থেকে বহু প্রতিষ্ঠিত গুণী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার স্কলার, ব্যবসায়ী, সৈনিক, সমাজসেবক দেশ প্রেমিকদের ছোট বেলার পায়ের ছাপ আজও মনে হয় এর প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে আছে।

এই ছাত্রাবাসের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ছোট ছোট কচি কাঁচাদেরকে শুধু মাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রম কার্যে বিভিন্ন কায়িকশ্রমে ও খেলাধূলায় সুষ্ঠু নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব দানের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাদেরকে দেশ এবং জাতির একটা কর্মক্ষম আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তোলা যারা জীবন যুদ্ধে কখনো পরাজয় স্বীকার করতে জানে না।

এই ছাত্রাবাসে ছোট ছোট আবাসিক ছাত্রদেরকে (১ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী) লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বী, কর্মঠ এবং নেতৃত্বদানকারী ছাত্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে বক্তৃতা আবৃত্তি, মার্চপাষ্ট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্পোর্টস্, কাবিং-স্কাউটিং, ব্যান্ড এগুলিতে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয়।

এছাড়া ছাত্রাবাসের ছাত্রদের কে সহপাঠক্রমের একটা অংশ হিসেবে প্রতিপর্বে আযান কিরাত-এর নিয়মিত ক্লাশ হয় এবং পরিশেষে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তা সমাপ্ত হয়।

ছাত্রাবাসগুলির একটা বিশেষ দিক সবার চোখে পড়ে। সেটা হল হাউসের বাগান। নানা রকম ফুলে সুশোভিত বাগানটিকে গার্ডেন প্রিফেক্ট এবং হাউস মাষ্টারের তত্ত্বাবধানে মালিদের সহযোগিতা, সাহায্য, পরামর্শ নিয়ে প্রতিটি ছাত্র বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে বিভিন্ন

দিনে পরিচর্যা করে থাকে এবং এটা আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতায় একটা বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার।

২নং ছাত্রাবাসের দেয়াল পত্রিকা 'উর্মি' হাউসের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় যার মধ্যে প্রতিটি পর্বে হাউসের ছাত্রদের গৌরব মণ্ডিত কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

পড়াশোনায় এই হাউসের ছাত্ররা তাদের এই হাউসের প্রাক্তন ছাত্র ভাই কামরুল ইসলামকে অনুসরণ করছে যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৯৭৭ সনে ঢাকা বোর্ডের এস, এস, সি পরীক্ষায় রেকর্ড মার্ক সহ প্রথম ও ১৯৭৯ সনে এইচ, এস, সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছিল এবং 'অলরাউণ্ডার ছাত্র' হিসাবে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে অত্যাধিক সুপরিচিত এবং বর্তমানে আমেরিকায় স্কলারশীপ নিয়ে অধ্যয়নরত। মাহবুবুর রহমান (১ম শ্রেণী), মামুনুর রহমান (২য় শ্রেণী) কাজি মোঃ খালেদ ও সাখাওয়াত হোসেন মোল্লা (৩য় শ্রেণী), সাইফুর রহমান (৪র্থ শ্রেণী), মোশফেক আনাম (৫ম শ্রেণী) এবং আনিসুজ্জামান ও আরিফুর রহমান (৬ষ্ঠ শ্রেণী) এর মত ছাত্ররা এই হাউসের "ভবিষ্যৎ কামরুল" বলে মনে করি।

খেলাধুলায় এই হাউস পিছিয়ে নেই। ১৯৭৮ সনে অনেক পয়েন্টের ব্যবধানে জুনিয়র-এ চ্যাম্পিয়ন হয়। মেহবুব হোসেন, সদরুল আমীন, ফারুক আহমেদ, সৈয়দ নাজিউল্লাহ্, লুৎফর রহমান শহীদ, এরা খেলাধুলায় এই হাউসের তথা এই স্কুলের কৃতিত্বের দাবীদার। হাউস ক্লিনলিনেস, মার্চ পাস্ট, ডিসিপ্লিন-এ ২নং হাউস চলতি বছর এবং বিগত বছরগুলিতে পূর্ণ পয়েন্ট পেয়ে সবার প্রশংসা পেয়ে আসছে।

গান, কবিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে এ হাউসের কচি-কাঁচাদের সুনাম বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। গান আবৃতি কৌতুকে সদরুল আমীন, ইমরান, ইসমাইল হায়দার, আবু হোসেন, খান সাইদ হাসান, মোসাদ্দেক, মোস্তফা আনোয়ার কাজমী সবার কাছে সুপরিচিত।

স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে এই হাউসে যত ছাত্রসংখ্যা ছিল বর্তমানে তার দ্বিগুনেরও বেশী ছাত্র এই হাউসে অবস্থান করছে। ছাত্রাবাসটির দ্বিতল ভবনের একটা অংশ অসমাপ্ত অবস্থায় থাকায় আরও বেশী ছাত্র নেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না।

এই ছাত্রাবাসটির বিভিন্ন কৃতিত্ব গৌরব কোন ব্যক্তিবিশেষের একক প্রচেষ্টার ফল-শ্রুতি নয়। সামগ্রিক ভাবে এই হাউসের আবাসিক, অনাবাসিক ছাত্র, কর্মচারীবৃন্দ, হাউস মেট্রন, হাউস টিউটর, হাউসমাষ্টার তথা কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা ও সহযোগীতা এই হাউসের সাফল্যের মূল-চাবিকাঠি।

৩ নং হাউস

হাউস মাষ্টার ঃ জনাব মোঃ আব্দুর রউফ
হাউস টিউটর ঃ জনাব সৈয়দ সাব্বির আহমেদ।
হাউস এলডার ঃ মাষ্টার মীর ইমাম হোসেন
হাউস প্রিফেক্ট ঃ মাষ্টার মোঃ আব্দুল গফ্ফার

৩ নং হাউস ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের কলেজ ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল একটি আবাসিক ভবন। কালগত বিচারে এই হাউস অর্বাচীন, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন কীর্তির মাধ্যমে এই ভবনের সম্ভাবনার সোনালী দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা পুঁথিগত বিদ্যার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের সর্বস্তরের পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভই তাদের একান্ত কাম্য। এই মহান উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে কলেজ ছাত্রদের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্মীলন কামনায় ১৯৭৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর, শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ জনাব জিয়া-উদ্দিন আহমেদ ও তৎকালীন হাউস মাষ্টার জনাব মুস্তাক আহমদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে ৩ নং হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই হাউস তার স্বকীয়তা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে অনবদ্য ঐতিহ্যের অধিকারী হয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে দীপ্যমান গন্তব্যে।

১৯৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষে ৩নং হাউসের ছাত্র মোঃ কামরুল ইসলাম বিদ্যালয়ের সর্বোত্তম ছাত্র (Best in academics) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং অধ্যক্ষের শীলড পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

১৯৭৮ ও ১৯৭৯ এই দুই বৎসর পর পর ৩নং হাউসের ছাত্র মাষ্টার ওয়াজেদ সালাম কলেজ ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হওয়ার গৌরবে ভূষিত হয়েছে।

পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে ৩নং হাউসের ছাত্রবৃন্দ নিজেদেরকে সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সমষ্টি বলে প্রতিপন্ন করেছে। প্রতি বছরের এইচ, এস, সি, পরীক্ষার ফলাফলই তার পরিচয় বহন করে। ১৯৭৯ সনের এইচ, এস, সি পরীক্ষায় এই হাউসের মোঃ গোলাম সামদানী অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে বলে আমরা আশাবাদী এছাড়া এদের সমষ্টিগত ফলাফল বাংলাদেশের যে কোন কলেজের চাইতে উত্তম।

জন্মলগ্ন থেকেই সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে এই হাউসের ছাত্রবৃন্দ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কার্যধারাকে নেতৃত্ব দান করে আসছে। ১৯৭৮ সনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে এবং বিজ্ঞান, চারু ও কারুকলা প্রদর্শনীতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাউসের ছাত্রবৃন্দ অভিভাবকবৃন্দের প্রশংসামুখর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে এই হাউসের মোঃ কামরুল ইসলাম প্রথম পুরস্কার লাভ করার গৌরবের অধিকারী হয়েছে।

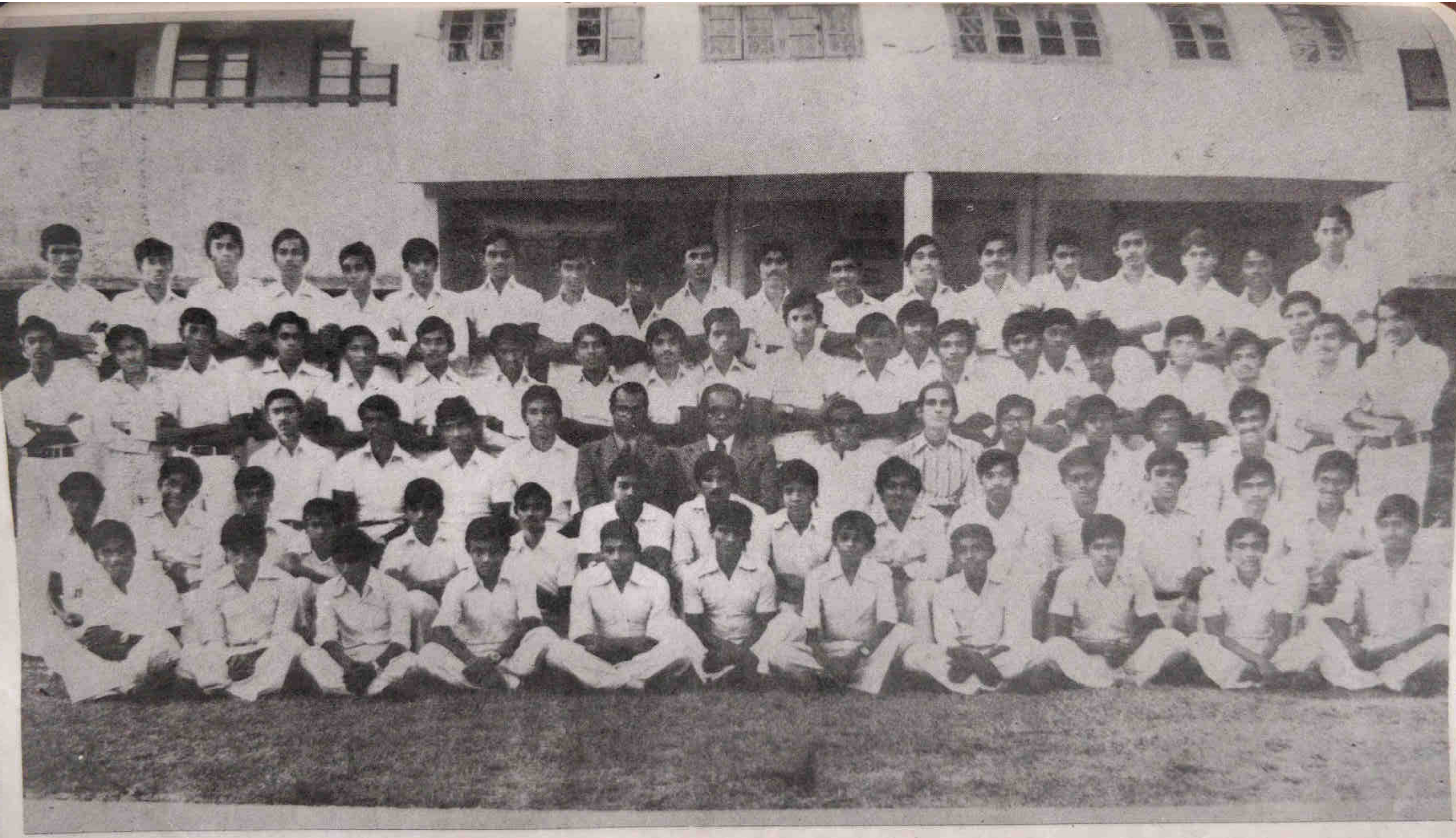

৩ নং হাউস

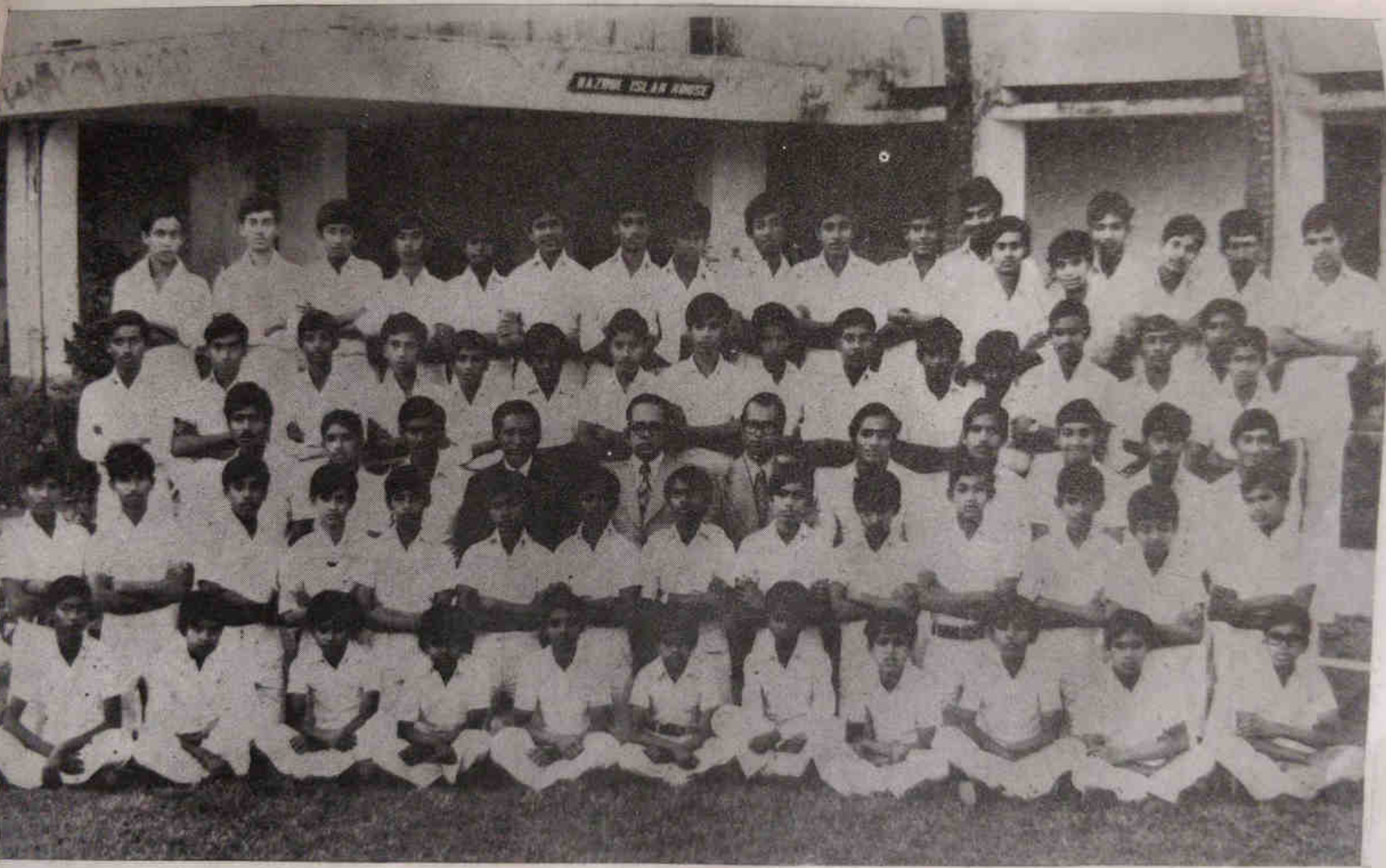

নজরুল হাউস

সহ পাঠ্যক্রমে ৩নং হাউসের ছাত্রদের সাফল্য অনবদ্য। ১৯৭৯ সনের ১ম ও ২য় পাবিক বিদ্যালয় বিতর্কে ৩নং হাউসের ছাত্রদের মধ্য থেকেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

১৯৭৮ সনের বার্ষিক তাঁবু বাস প্রতিযোগিতায় ৩নং হাউসের ছাত্রদের দু'টি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও তৃতীয় স্থান এবং ১৯৭৯ সালের বার্ষিক তাঁবুবাস প্রতিযোগিতায় তাদের দু'টি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এই তাঁবুবাসে ৩নং হাউসের মাষ্টার ওয়াজেদ সালাম চীফ মার্শাল এবং মাষ্টার মীর ইমাম হোসেন ডেপুটি চীফ মার্শাল নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল।

আজান ও কিরাত প্রতিযোগিতায়ও ৩নং হাউসের বিজয় অনন্য। ১৯৭৯ সনের ১ম ও ২য় পাবিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ৩নং হাউস দুই বার-ই প্রথম স্থান লাভ করার অধিকারী হয়েছে। ২য় পাবিক আজান প্রতিযোগিতায় ৩নং হাউসের আবদুল গাফ্ফার (লাল) প্রথম স্থান প্রাপ্ত (Wing Best) হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ১ম পাবিক কিরাত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান প্রাপ্ত (Wing Best) হওয়ার সন্মান লাভ করেছে ৩নং হাউসের মোঃ শাহাদৎ হোসেন।

বিদ্যালয়ের ক্রীড়াঙ্গনেও ৩নং হাউসের পদচারণা কৃতিত্বের গৌরবে সমুন্নত। ১৯৭৯ সনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বড়দের ১৫০০ মিঃ দৌড়ে এই হাউসের মোঃ শাহাদাৎ হোসেন প্রথম স্থান অধিকার করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সামগ্রিক ফলাফলও খুবই সন্তোজষজনক। এছাড়া আন্তঃ হাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রিকেট খেলায় ৩নং হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ভলিবল এবং হকিতেও ফুটে উঠেছে তাদের সাবলিল ক্রীড়া নৈপুণ্যের স্বাক্ষর।

সৃষ্টি সুন্দর প্রজ্ঞা বিকাশের জন্য ছাত্রদের তত্বাবধানে দেয়াল পত্রিকা 'উন্মীলন' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনার মাধ্যমে তারা তাদের সাহিত্যানুরাগ ও সুকুমার বৃত্তিকে প্রাঞ্জলভাবে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছে। ইংরেজীতেও তারা La Blume নামে একটি দেয়াল পত্রিকা বের করে থাকে। তাদের এই আত্মপ্রেরণা হাউসের গৌরবের সমৃদ্ধ তোরণকে দীপ্তিময় করে তুলেছে।

রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল ৩নং হাউসের। ইতিমধ্যেই তাদের সামগ্রিক কার্যধারা এই প্রতিশ্রুতিকে অভূতপূর্ব সফলতা দান করেছে। ৩নং হাউসের ছাত্ররা এগিয়ে চলছে শত ফুল ফুটানোর প্রত্যয় নিয়ে। তাদের ঋজুতা দ্বারা তারা দূর করবে সকাল বাধা। সমস্ত প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে তাদের অগ্রাভিযান ব্যঞ্জনা লাভ করবে বিন্দু থেকে বৃত্তে--এই বিশাল পৃথিবীর বুকে তারা এগিয়ে চলবে দৃপ্ত পদে।

ছাত্রাবাস শিক্ষকের প্রেরণা, ছাত্রদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, কর্মপ্রচেষ্টার উদ্যোগ ও তাতে সকলের অংশ গ্রহণই ৩নং হাউসের অভূতপূর্ব সাফল্যের চাবিকাঠি। আমাদের এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে। যদি আমাদের ডাক শুনে কেউ না আসে তবে আমরা একাই এগিয়ে চলবো আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে।

নজরুল ইসলাম হাউস

হাউস মাষ্টার ঃ জনাব মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ

হাউস টিউটর ঃ জনাব মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান

হাউস এলডার ঃ মাষ্টার সারওয়ার হোসেন

হাউস প্রিফেক্ট ঃ মাষ্টার নস্‌রুল হামিদ।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামানুসারে এ ছাত্রাবাসটির নামকরণ করা হয় 'নজরুল ইসলাম হাউস'। অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা ও বিস্ময়কর প্রতিভাধর কবির জীবনাদর্শ এ হাউসের ছাত্রদেরকে দিয়েছে কর্মের অনুপ্রেরণা ও উদ্দিপনা। সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও অসত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার কবি কণ্ঠ তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাশীল হ'তে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপত করেছে। কবির কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারা গেয়ে থাকে, আমরা শান্তি 'আমরা বল, আমরা ছাত্রদল'।

এ হাউসে আবাসিক ছাত্রের আসন সংখ্যা আশি। এ ছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক অনা-বসিক ছাত্র এ হাউসের সঙ্গে সংযুক্ত। আবাসিক, অনাবাসিক নির্বিশেষে এ হাউসের ছাত্ররা স্কুলের পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রমভুক্ত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাফল্যের এক সুমহান ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে।

ঢাকা বোর্ডের এস, এস, সি পরীক্ষায় আমাদের স্কুল থে.ক অংশ গ্রহণকারী ছাত্রদের মধ্যে এ হাউস থেকে ১৯৭৮ সালে বিজ্ঞান বিভাগে ৭ জন এবং মানবিক বিভাগে ২ জন, এবং ১৯৭৯ সালে বিজ্ঞান বিভাগে ১৬ জন ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৬৩টি লেটার নম্বরসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

এ বছর এ হাউসের ছাত্র ৭ম শ্রেণীর বায়েজিদ খুরশীদ রিয়াজ বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত 'সঞ্চয়ীরাই স্বনির্ভর' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান এবং বিশ্ব ডাক ইউনিয়নের উদ্যোগে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ আয়োজিত 'আমার দেশের দর্শনীয় স্থান' শীর্ষক পত্র লিখন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

১৯৭৭-৭৮ সালে লেখাপড়া, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আভ্যন্তরীণ খেলাধূলা, বহি-রাঙ্গন খেলাধূলা, আজান, কিরাত, হাউস পরিচ্ছন্নতা, কুচকাওয়াজ ও শৃংখলা, বাগান তৈরী ও বৃক্ষ রোপন—এ আটটি আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতার পাঁচটিতেই এ হাউসের ছাত্ররা জয়লাভ করে চ্যাম্পীয়নশীপ কাপ অর্জন করে। ১৯৭৮-৭৯ সালের হকি, ফুটবল, বাস্কেট বল ও দাবা প্রতিযোগিতায় নজরুল ইসলাম হাউস বিজয়ী হয়। এ হাউসের ছেলে আফতাব মোল্লা ১৯৭৮ সালে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ বলে ঘোষিত হয়।

হাউসের ছাত্র খাজা হাবীবুল্লাহ ও সারওয়ার হোসেন ১৯৭৮ সালে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় এবং সারওয়ার হোসেন ও নসরুল হামিদ ১৯৭৯ সালে জাতীয় যুব হকি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়ে এ হাউসের ছাত্র আফতাব মোল্লা (সিনিয়র গ্রুপে) এবং আবদুল জামাল (ইন্টার মিডিয়েট গ্রুপে) 'বাংলাদেশের দ্রুততম কিশোর' খেতাবে ভূষিত হয়। ভারতের আগ্রায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান ইন্টার স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ স্কুল দলের পক্ষে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে এ হাউসের প্রাক্তন ছাত্র আবদুল জামাল। ভারতের বাইরের ছয়টি দেশের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ স্কুল দল চ্যাম্পীয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

স্কুলের চারু ও কারু কলা প্রতিযোগিতায় এ হাউসের ছাত্র নসরুল হামিদ চারুকলায় এবং আরশাদ আলম কারুকলায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে।

এ হাউসের ছেলেদের উপরোল্লিখিত সাফল্যের পেছনে রয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের উৎসাহব্যঞ্জক উপদেশবাণী এবং হাউসের অভ্যন্তরে ও বাইরে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও শিক্ষিকা মণ্ডলীর মূল্যবান পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা। তাঁদের পরম আশীর্বাদ শিরোধার্য করে এ হাউসের ছাত্ররা সামনে আরও উজ্জ্বলতর সাফল্যের লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে, এ আশা অন্তরে দৃঢ়ভাবে পোষণ করছি।

ফজলুল হক হাউস

হাউস মাষ্টার ঃ জনাব শেখ মোঃ ওমর আলী।
হাউস টিউটর ঃ জনাব মোঃ আব্দুল আলীম।
হাউস এল্ডার ঃ মাষ্টার জামিল আব্দাল
হাউস প্রিফেকট ঃ মাষ্টার রেজাউর রহমান

স্নেহসুধামাখা বাসগৃহ হ'তে শত যোজন দূরে থেকেও নিজগৃহে বাস করার মিষ্টি মধুর সুখানুভূতির কুঁড়িগুলো মাঝে-মাঝে মেলে ধরতে কার না ইচ্ছে করে? ইচ্ছে করলেইতো আর সবকিছু মেলে ধরা যায় না স্বল্প পরিসরে। আমাদের দ্বিতীয় বাসগৃহের পরতে পরতে থরে বিথরে সাজানো রয়েছে কত না অব্যক্ত কথা, কত না মধুর স্মৃতি, কত না ঐতিহ্যময় গৌরব গাঁথা। গৌরবময় অতীত যদি বর্তমানের আশার আলো হয়, নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সে আলো আমাদের আছে, বিদ্যালয় বার্ষিকীর পাতাগুলো উল্টালেই ঝলক দিয়ে এক পলকে বেরিয়ে আসবে সে আলোর দ্যুতি।

আমাদের পূর্বসূরী কামরুল ইসলাম এস, এস, সি পরীক্ষায় (১৯৭৭) সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান এবং শামীমুল হক এইচ, এস, সি পরীক্ষায় (১৯৭৫) সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৮ সালে এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় আবুল কালাম আজাদ ও আ, ব, ম, শহীদুল আরেফীন সম্মিলিত মেধা তালিকায় যথাক্রমে চতুর্থ ও নবম স্থান অধিকার করে ফজলুল হক ছাত্রাবাসের ঐতিহ্যকে সমুজ্জ্বল করেন। সেই গৌরবময় অতীতের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের বড় ভাই খালেদুল ইসলাম ১৯৭৯ সালের এস, এস, সি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করেন। আমরা তাঁকে আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সেই সংগে তাঁর আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। ১৯৭৯ সালে আমাদের ছাত্রাবাসের ৭জন ছাত্র মানবিক বিভাগে এস, এস, সি পরীক্ষায় অংশ নেন। এঁদের মধ্যে বড় ভাই শাহজাদা ও কবীর-বিন-আনোয়ার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে একাডেমীক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখেছেন। বাকী ৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং একজন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিজ্ঞান বিভাগে ২জন তারকা লাভ করেছেন। দুইজন তারকাসহ মোট ৪ জন প্রথম বিভাগে এবং ২ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একজন অকৃতকার্য। এ যেন প্রদীপের নীচে অন্ধকার। এ সত্যকে অস্বীকার করি কেমন করে? যারা শ্রেণী পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এ, কে, এম, তারেক, এ, কে, এম, সালেক, খাজা রহমতুল্লা ও আবুল ফজলের নাম উল্লেখযোগ্য।

কেবল লেখাপড়াতেই নয়, সহপাঠ্যক্রম ক্রিয়াকলাপেও আমাদের ছাত্রাবাসের পতাকাকে সমুন্নত রাখতে এতটুকু কসুর করিনি। কিন্তু শত প্রচেষ্টা সত্বেও ১৯৭৮ সালের

ফজলুল হক হাউস

ফুটবল দল

হকি দল

চ্যাম্পিয়ানশীপ শীল্ড আমরা ধরে রাখতে পারিনি, তাই বলে ভাগ্নোদ্যমে হইনি। বরং নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আন্তঃছাত্রাবাস প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি এবং তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লাভ করেছি বিজয়মাল্য। জুনিয়র গ্রুপে আশরাফ তারিন এবং ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপে শেখ মোঃ নাসের, শওকত আলম ও তাজুল ইসলাম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইনডোর গেমসে দাবাতে এবং টেবিল টেনিসে যথাক্রমে এ, কে, এম, ফায়েজ ও সাব্বির আহসান সেরা খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে।

গত বছর বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে আমাদের ২০টি সেগুনের চারা দেওয়া হয়েছিল। আনন্দে আত্মহারা হই যখন দেখি ২০টি সতেজ-সবুজ-শ্যামল চারা মাথা উঁচু করে ছাত্রাবাসের তিনদিক ঘিরে আছে। তাঁদের উঁচু মাথা যেন আমাদেরই মাথাকে উঁচু করেছে। সারাটি বছর ধরে পালাক্রমে সযত্নে লালন করেছি এই বোবা শিশুদের। তাদের প্রাণবন্ত বৃদ্ধির মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের কায়িক শ্রমের মর্যাদা আর সার্থকতা। যেদিন তারা মহীরূপে পরিণত হয়ে গর্বোন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকবে সেদিন হয়তো আমরা কেউ থাকবো না। থাকবে আমাদের সৃষ্টি, আমাদের কীর্তি।

সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের ঐকান্তিকতা আর নিরলস সাধনার ফলে বড়দের শাখায় আন্তঃছাত্রাবাস প্রতিযোগিতায় আমরা চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করেছি। প্রতিযোগিতার আটটি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতে জয়লাভ করে ১৬ পয়েন্টের মধ্যে ১০ পয়েন্ট পেয়ে আমাদের ছাত্রাবাস চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতার ফলাফল নিচে দেয়া হ'ল--

(১)	এ্যাকাডেমিক্স--	০
(২)	বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা--	২
(৩)	আউটডোর গেম্‌স্‌--	০
(৪)	ইনডোর গেমস--	২
(৫)	কিরাত--	২
(৬)	আজান--	০
(৭)	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা--	২
(৮)	বৃক্ষরোপণ ও কায়িক শ্রম--	২
	মোট	১০

আমাদের ছাত্রাবাসের বয়স কুড়ি না পেরুলে কি হবে? কত যে কুঁড়ি এই সল্প সময়ে এসেছে, কত যে কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটেছে তার ইয়ত্তা নেই। এ বছরের কথাই ধরা যাক না। বছরের শুরুতেই ছোটদের শাখা থেকে ৩২টি নতুন কুঁড়ি যোগ দিয়েছিল আমাদের সাথে। নতুন বরণ অনুষ্ঠানে জানিয়েছিলাম তাদের সাদর অভ্যর্থনা, মুছে দিতে প্রয়াস পেয়েছিলাম চির-চেতনার গণ্ডী ছেড়ে আসার অব্যক্ত ব্যথা আর বেদনা। সেই একই অনুষ্ঠানে প্রিফেক্টদের শপথ গ্রহনের অনুষ্ঠান পর্বটিও সেরে নিয়েছিলাম। নয়ত কাজের চাপে ওটি আর হয়ে উঠতো না। এদিকে থেকে সত্যিই আমরা ভাগ্যবান। যাহোক, প্রথম পর্বে আমরা ৮৮ জন ঠাসাঠাসি করে দিব্যি আরাম-আয়াসে মহানন্দে কাটিয়েছি। তাই বলে পরিক্ষার্থী বড় ভাইদের কথা ভুলে যাইনি। ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে তাদের বিদায় জানিয়েছি। দ্বিতীয়

পর্বের শুরুতে তাদের শূন্য স্থানগুলো আমাদের পীড়া দিয়েছে, বারবার তাঁদের স্নেহমাখা মুখগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তাদের শূন্যস্থানগুলো দেখে একটা সত্যকে উপলব্ধি করেছি—একদল যায়, আর একদল আসে। এটাই বিদ্যা নিকেতনের অমোঘ নিয়ম—এ নিয়মে আমরাও একদিন বিদায় নেব। কিন্তু তা তার আগে আমরা আমাদের স্বাক্ষর রেখে যেতে চেষ্টার ত্রুটি করব না।

দুরারোগ্য ক্যান্সার চিরতরে ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের সবার প্রিয় আইয়ুব কামালকে (ইন্না লিল্লাহে-------রাজেউন) আইয়ুব কামাল আর আমাদের মধ্যে নেই—এই ছোট সংবাদটি দ্বিতীয় পর্বের শেষ দিনে এসেছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায়। শোকাভিভূত বিদ্যালয় নীরবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তার রূহের মাগফেরাত কামনা করেছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে জানিয়েছে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি। সে চলে গেছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়কুঞ্জে রেখে গেছে ফুলের মত মিষ্টি হাসি, অমায়িকতা ও সহমর্মিতা।

বর্তমানে আমরা ৭২ জন। আমাদের চলার পথের দিশারী হচ্ছে মানব দরদী এ, কে, এম, ফজলুল হকের সুমহান জীবনাদর্শ যার যাদুস্পর্শে আমাদের জীবন হবে সুন্দর, সফল ও সার্থক।

বিদ্যালয় সংবাদ

কৃতিছাত্র গোলাম সামদানী (বিজ্ঞান বিভাগ)

ঢাকা বোর্ডের ১৯৭৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় কেবল প্রথম স্থানই অধিকার করেনি সর্বমোট ৯৩২ নম্বর পেয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার নতুন রেকর্ডও সৃষ্টি করেছে। সে ১৯৭৭ সালে কুমিল্লা বোর্ডের এস, এস, সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। তাকে আমরা প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

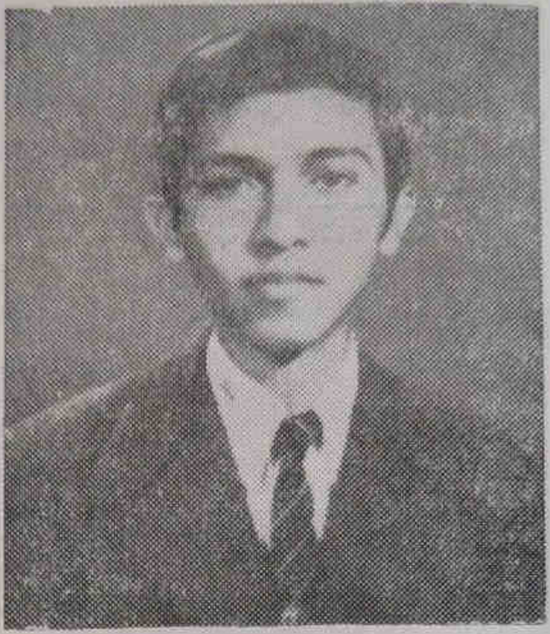

কৃতিছাত্র কামরুল ইসলাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

১৯৭৯ সালে ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৮৪ নম্বর পেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে। সে ১৯৭৭ সালে ঢাকা বোর্ডের এস, এস, সি পরীক্ষায় ৮৩৯ নম্বর পেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে। তার প্রবাসী শিক্ষা জীবন সফল হোক। সুন্দর হোক।

কৃতিছাত্র মুজিবর রহমান (বিজ্ঞান বিভাগ)

১৯৭৯ সালে ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় একাদশ স্থান অধিকার করে। আমরা তার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

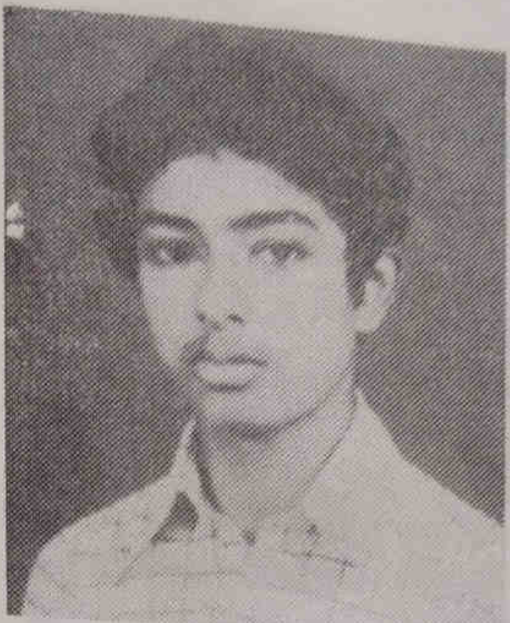

কৃতিছাত্র হাবিবুল্লাহ নেয়ামুল করিম (বিজ্ঞান বিভাগ)

ঢাকা বোর্ডের ১৯৭৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করে। আমরা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

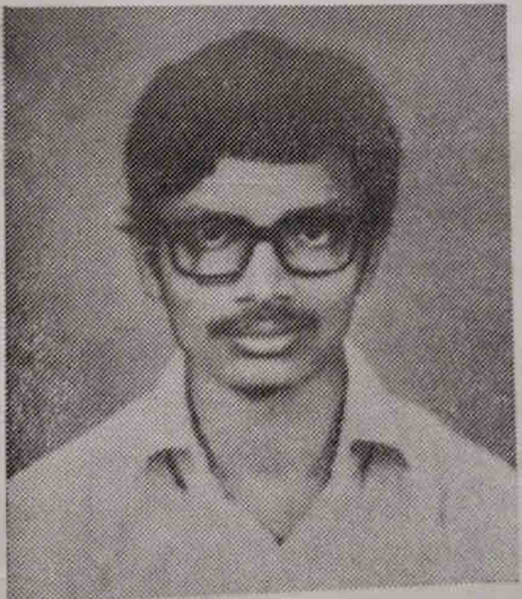

কৃতিছাত্র মোঃ কামরুল হাসান (বিজ্ঞান বিভাগ)

১৯৭৯ সালে ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বাদশ স্থান লাভ করে। তার ভবিষ্যৎ জীবন আরও সুন্দর হোক, সার্থক হোক।

কৃতি ছাত্র আযফার হুসাইন (মানবিক বিভাগ)

ঢাকা বোর্ডের ১৯৭৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করে। তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

কৃতিছাত্র খালেদুল ইসলাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

১৯৭৯ সালে ঢাকা বোর্ডের এস, এস, সি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ত্রয়োদশ স্থান লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করে। আগামী দিনগুলোতে আরও ভাল ফল কামনা করি।

আবুল কালাম আজাদ (বিজ্ঞান বিভাগ)

১৯৭৮ সালে ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করে। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎই আমাদের একমাত্র কাম্য।

আ, ব, ম শহীদুল আরেফীন (বিজ্ঞান বিভাগ)

১৯৭৮ সালে ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করার কৃতিত্ব লাভ করে। তার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎই আমাদের কাম্য।

শোক সংবাদ

১৯৭৯ সালের এস, এস, সি পরীক্ষার্থী খাজা হাবিবুল্লা ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আয়ুব কামাল আজ আর আমাদের মধ্যে নেই (ইন্নালিল্লাহে----রাজেউন)। এ জগতের লেনা-দানা চুকিয়ে দিয়ে তারা চিরতরে বিদায় নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে, তারা চলে গেছে, কিন্তু তাদের স্মৃতি? আমরা তো তা মুছে ফেলতে পারিনি। আর পারেনি বলেই তাদের স্মৃতি প্রভাতের শুক তারার ন্যায় আমাদের মনের মণি কোঠায় ভাস্বর হয়ে আছে। তাদের অমায়িক ব্যবহার ফুলের মত হাসি আর জ্ঞান-পিপাসা আমাদের মানসচক্ষে ভেসে উঠে প্রতিনিয়তই।

বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা, বিজ্ঞানের চরমোন্নতির যুগেও তাদের জীবন-শক্তি তিলে তিলে ক্ষয় হয়েছে, তারা দিনে দিনে অবধারিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানের অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার তাদের ধরে রাখতে পারেনি। দুরারোগ্য ক্যান্সার মানুষের জ্ঞান-গরিমার সব অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়ে চিরতরে ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের। আফসোস। দু'টি ফুল না ফুটতেই ঝরে পড়ল ধরণীতে। প্রাক্তন ছাত্র মঈনুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিং পুলে ডুবে মারা যান (ইন্নালিল্লাহে----রাজেউন)। তাঁর মর্মান্তিক অকাল মৃত্যু আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আফসোস! আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে হারালাম একজন প্রাক্তন কৃতি ছাত্রকে।

মৃত্যুর হিম-শীতল কঠিন নিষ্ঠুর হস্ত স্পর্শ করেছে আমাদের প্রাক্তন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এম, এ, মতিনকে (ইন্নালিল্লাহে----রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক। শিক্ষকতাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। প্রায় অর্ধশতাব্দী-কাল মানুষ গড়ার কারখানা সুদক্ষ কারিগর রূপে কাজ করেছেন। তিনি আমাদের এই বিদ্যা নিকেতন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। জ্ঞান প্রদীপ জ্বালানো ছিল তাঁর নেশা। তাই সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলেও. নেশাই তাঁকে আবার টেনে এনেছিল শিক্ষায়তনে। কর্তব্যপরায়নতা, সততা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও অন্যান্য মানবিক গুনাবলীর জন্যই তিনি আজও বেঁচে রয়েছেন নিজ হাতে গড়া শত সহস্র ছাত্রদের মধ্যে, সহকর্মী ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে।

যারা একদিন আমাদের মধ্যে ছিল অথচ আজ আর নেই, তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয় বিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবেশে এবং সন্তপ্ত পরিবারকে পরম করুণাময় আল্লাহতালা যেন শোক বহন করার মত তৌফিক দান করেন—এই মোনাজাতও করা হয়।

বাস্কেট

ক্রিকেট দল

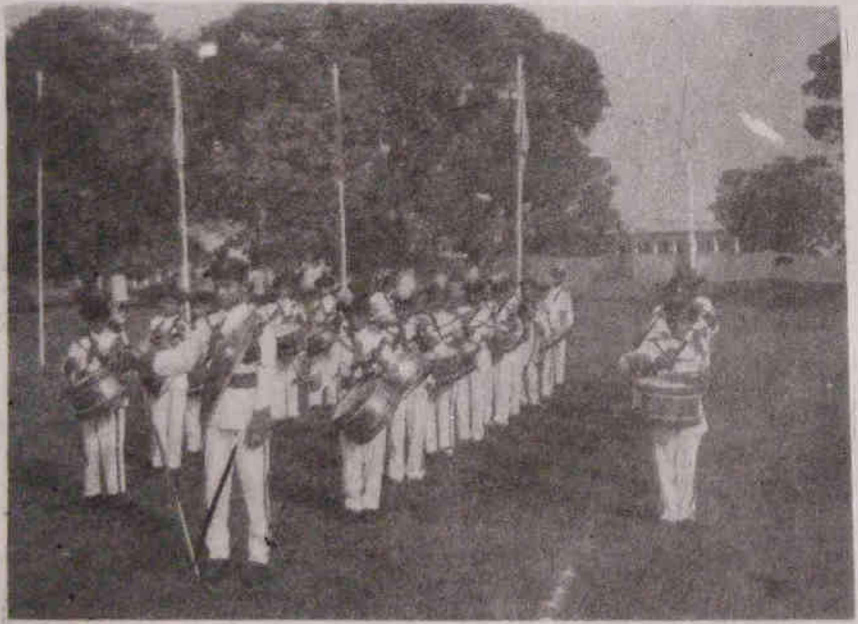

সহপাঠ্যক্রম ক্রিয়াকলাপ

অধ্যক্ষের রিপোর্ট

সপ্তদশ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পঠিত

মাননীয় প্রধান অতিথি, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,

আসসালামো আলায়কুম।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের সপ্তদশ পুরস্কার বিতরণী উৎসবে আপনাদের শুভাগমন আমাদের যুগপৎ আনন্দিত ও গর্বিত করেছে। এজন্যে প্রথমেই আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের আজকের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জনাব শাহ্ আজিজুর রহমান মহোদয়কে যিনি শত কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও এই স্কুলের উদীয়মান ছাত্রদের স্নেহের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর অতি মূল্যবান সময়ের কিছুটা ভাগ দিয়ে আমাদের সকলকে ধন্য করেছেন। তিনি একজন অতি প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ রাজনীতিক হিসেবে জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন যুগসন্ধিক্ষণে এদেশের মানুষকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের দেশের সমস্যার কোন অন্ত নেই। অন্ন বস্ত্রের সমস্যার পরই আমাদের শিক্ষার সমস্যা। এই প্রধান সমস্যা সমাধানের গুরু দায়িত্ব এখন তিনি বহন করে চলেছেন। দেশ তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে এ সমস্যার অসহনীয় গুরুভার লাঘব করতে পারবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আজকে আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি এবং তাঁর আশিস্‌বাণী এই স্কুলের কোমলমতি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাদের জীবনে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

সুধীমণ্ডলী, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যময় স্কুল হিসেবে শুধু লেখাপড়াই নয়, বরং ছাত্রদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। অতীত এবং বর্তমান সরকার এ স্কুলকে একটি স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দিয়ে এ ব্যাপারে পূর্ণ সহায়তা দান করেছেন। এ স্কুলের স্বল্পকালীন সময়ের ভিতরে প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করা হয় ১৯৬৪ সনে। তারপর থেকে মাত্র ১৫ বছর সময়ের মধ্যে প্রাক্তন ছাত্ররা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ স্কুলে শিক্ষা লাভের সার্থকতা প্রমান করেছে। কেবল পরীক্ষা পাশের হার যদিও শিক্ষার একমাত্র মানদণ্ড নয় তবুও বিভিন্ন চূড়ান্ত পরীক্ষায় ক্রমাগত শতকরা একশ' ভাগ সফলতা—যা এ

স্কুলের ঐতিহ্যে পরিণত হ'য়েছিল—যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গৌরবের ব্যাপার। আমি ১৯৭৫ সনের ১লা এপ্রিল থেকে এ স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে সামান্য খেদমত করার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।

বৃক্ষরোপণ করে দীর্ঘ দিন যত্ন ও ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা করতে হয় ফল ভাল জন্মাবে কিনা তা দেখার জন্যে। ভাল গাছ একবার জন্মাতে পারলে তা নষ্ট হতেও সময়ের প্রয়োজন। এ উপমা যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে চরম সত্য। ষাট দশকের শেষের দিক থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানা রকম বাহ্যিক চাপের শিকার হয়। ১৯৭১ সালে স্বাভাবিক কারণেই এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা স্থবির হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক পরবর্তী বছরগুলোতে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রতিফলতি হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও। এ স্কুলের জন্যেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। এ রিপোর্টের পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ' এর দিকে তাকালেই দেখা যাবে এখানে পরীক্ষা পাশের হার ক্রমান্বয়ে নেমে এসে শতকরা আশির কাছাকাছি পেঁাছায়। কিন্তু আমি আপনাদেরকে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, এ স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্রদের ঐকান্তিক সাধনা ও প্রচেষ্টার ফলে আমরা এ নিম্নগতির ধারা কাটিয়ে উঠে আমাদের উর্ধ যাত্রা আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে আমাদের ফলাফল ক্রমাগত ভাল হয়েছে। ১৯৭৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মাত্র একজন ছাড়া সকলেই পাশ করেছে এবং একজন ছাত্র সম্মিলিত মেধা তালিকায় ত্রয়োদশ স্থান দখল করেছে। চলতি সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতকরা একশ' ভাগ পাশ সহ আমাদেরই ছাত্ররা পরম সফলতা অর্জন করেছে। এ স্কুলের ছাত্র গোলাম সামদানী ঢাকা বোর্ডের রেকর্ড ভঙ্গ করে সর্বমোট ৯৩২ নম্বর পেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। দ্বিতীয় স্থানও অধিকার করেছে আমাদের ছাত্র কামরুল ইসলাম সর্বমোট ৮৮৪ নম্বর পেয়ে। এ ছাড়া এ স্কুলেরই একটি ছেলে একাদশ স্থান ও দুটি ছেলে যুগ্মভাবে দ্বাদশ স্থান এবং মানবিক বিভাগে একটি ছেলে তৃতীয় স্থানও অধিকার করেছে। এ সাফল্য নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে গর্বের বিষয়। আমরা আশা করি, আপনাদের শুভাশিস নিয়ে আগামী বছরগুলোতেও অনুরূপ ফলাফলের ধারা বজায় রাখতে পারব।

ক্যাডেট কলেজগুলোর মত এ স্কুলের ছাত্রদের হোস্টেল খরচের জন্যে কোন সরকারী ভর্তুকি দেয়া হয় না। সে জন্যে নির্বাচনী পরীক্ষা পাশ করেও অনেক মেধাবী ছাত্র এখানে অর্থাভাবে আসতে পারে না। ফলে, অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্র আমাদেরকে গ্রহণ করতে হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে তিন বছরের জন্যে আমাদের সদাশয় সরকার উন্নয়ন বাজেট থেকে একটা স্কলারশিপ ফাণ্ডের ব্যবস্থা করায় গত কয়েক বছরে আমরা স্বল্প সংখ্যক গরীব মেধাবী ছাত্রকে ভর্তি করতে পেরেছি। এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে স্কলারশিপ ফাণ্ডকে Recurring বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে আমরা ইতিমধ্যেই আবেদন করেছি এবং তা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এ স্কুলের মত একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপটিমাম বা পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্যে আমি মনে করি, জাতীয় স্বার্থে এ ফাণ্ডকে চিরস্থায়ী এবং ব্যাপকতর করা অপরিহার্য। আমি এ বিষয়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে গরীব মেধাবী ছাত্রদের জন্যে গত বছর থেকে প্রধানতঃ স্বেচ্ছামূলক দানের ভিত্তিতে একটি ছাত্রকল্যাণ তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া উচ্চতম শ্রেণীর গরীব মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় নীচের শ্রেণীর ছাত্রদের অবসর সময়ে প্রাইভেট পড়াতে চায় তাদেরকে অনুরূপ অনুমতি দেয়া হয়। এটা আমাদের জন্যে পরিতৃপ্তির বিষয় যে, গত কয়েক বছরে বেশ কয়টি ছেলে এভাবে স্বনির্ভর হ'য়ে এ স্কুল থেকে পাশ করে মিলিটারী ও মেরিন একাডেমীর মত প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগদান করে জীবনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

অন্যান্য বছরগুলোর মত গত বছরেও ছাত্রদের বিভিন্ন গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থাদি আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের ছাত্ররা এ বছর ঢাকা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃস্কুল ভলিবল প্রতিযোগিতায় মোহাম্মদপুর জোনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। কুমিল্লা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের সঙ্গে এ বছর একটি প্রীতি বাস্কেট বল খেলায় জয়লাভ করে এবং ফুটবল খেলায় ড্র করে।

আমাদের এবারের সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক তাঁবুবাস অনুষ্ঠিত হয়েছে মৌচাক স্কাউট ক্যাম্প এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশে। এ ধরনের তাঁবুবাসের মাধ্যমে এমন কতকগুলো কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় যাতে করে আমাদের ছাত্ররা বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সাথে কিছুটা পরিচয় লাভ করতে পারে এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রশিক্ষণ পায়। রেডিও, টেলিভিশনে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় আমাদের ছাত্ররা অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ এবং আত্মবিশ্বাস বর্ধনের সুযোগ পায়। গত বছরও আমাদের ছাত্ররা এ রকম কয়েকটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। তাছাড়া গত বছর Islamic Cultural Research Academy আয়োজিত 'রমজানের তাৎপর্য' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় আমাদের স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র কবীরুল হাসান প্রথম স্থান অধিকার করে। আমাদের আর একজন ছাত্র, ৭ম শ্রেণীর বায়েজিদ খুরশীদ রিয়াজ এ বছর বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত 'সঞ্চয়ীরাই স্বনির্ভর' শীর্ষক রচনা প্রেতিযোগিতায় প্রথম স্থান এবং বিশ্ব ডাক ইউনিয়নের উদ্যোগে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ আয়োজিত পত্র রচনা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

শ্রমের মর্যাদা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শারীরিক পরিশ্রমের নিয়মিত কর্মসূচীর আওতায় আমাদের ছাত্ররা তাদের পরিপার্শ্বিকতা পরিচ্ছন্ন রাখা, বাগান তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ পরিচর্যামূলক কাজে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমাদের ছাত্ররা কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতা ও প্রচার কার্য ছাড়াই এ যাবত যত বৃক্ষ রোপন করেছে তার শতকরা ৯৫ ভাগই সুস্থ ও সতেজভাবে তাদের কলেবর বৃদ্ধি করে চলেছে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এ দৃষ্টান্ত অনুসৃত হ'লে সরকারের বৃক্ষরোপণ অভিযান নিঃসন্দেহে আরও সফল হ'য়ে উঠত।

শিক্ষামূলক সহপাঠ্যক্রম কর্মসূচীর আওতায় এবার এ স্কুলের ছাত্ররা কুমিল্লা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, সোনারগাঁ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমৃদ্ধ ময়নামতি ভ্রমণ করেছে। চিড়িয়াখানা ও শিশু পার্কে গিয়েছে। স্থানীয় কয়েকটি প্রসিদ্ধ কারখানা যেমন

মিল্কভিটা ফ্যাক্টরী, নাবিস্কো বিস্কুট ফ্যাকটরী, আদমজী জুট মিল্স, গাজীপুর বাংলাদেশ মেশিন টুল্স ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তারা আমাদের ছাত্রদের তাঁদের কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ সুযোগে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাক্তিকে আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

প্রশাসনিক সুব্যবস্থা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই বিশেষতঃ এ ধরনের একটি আবাসিক স্কুলের উন্নতি সম্ভব নয়। গত বছরগুলোতে এদিকেও আমাদের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি এক হিসেবে দেখা যায় এ স্কুলের হোস্টেল ফাণ্ডে তখন ঘাটতি দাঁড়িয়েছিল ২,৭২,৮২২·০০ টাকা। তখন থেকেই এ বিরাট ঘাটতির গতি রোধ করার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সকল অভিভাবকের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় বর্তমানে এ ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি বলে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। তখন ছাত্রদের খাদ্য তালিকায় সাময়িকভাবে কিছু কাট ছাঁট করতে হয়েছিল। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি ঘোষণা করছি যে, গত বছরের জানুয়ারী থেকে সাবেক খাদ্য তালিকা আমরা পুনর্বহাল করতে পেরেছি। এবং গত দু'বছরে সাধারণ দ্রব্যমূল্য কয়েকগুন বেড়ে যাওয়া সত্বেও হোস্টেল চার্জ বাড়ানো হয়নি। পরিশিষ্ট 'খ' তে উল্লেখিত আমাদের হোস্টেলের বর্তমান খাদ্য তালিকা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তুলনামূলকভাবে এটা একটা সুষম খাদ্য তালিকা। কঠোর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার কিভাবে কমানো সম্ভব হয়েছে তা পরিশিষ্ট 'গ'-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যায়। বিস্তৃততর বিবরণের অবকাশ এখানে না থাকায় বিশেষভাবে নির্বাচিত মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিয়েই এ ব্যাপারে ইতি টানছি।

মাননীয় প্রধান অতিথি, এখানে আমাদের কয়েকটি সমস্যার প্রতি আপনার সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ১৯৭২ সন থেকে এখানে ছাত্র সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় এখনও অনেকেই অনাবাসিক ছাত্র হিসেবে ক্লাশ করছে। এ ব্যবস্থা স্কুলের বিভিন্ন কর্মধারা ও বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। এখানে যে সব শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োজিত আছেন তাঁদের প্রায় সকলকেই নির্ধারিত সময়সূচীর বাইরেও কাজ করতে হয়। এজন্যে তাঁদের সকলের স্কুলের ভেতরে অবস্থান একান্ত প্রয়োজন বিধায় সরকার বিশেষ বিবেচনায় তাঁদের জন্যে বিনা ভাড়ায় বাড়ী বরাদ্দের ব্যবস্থা রেখেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যার তুলনায় বাড়ীর সংখ্যা অপ্রতুল বলে অনেকেই তাঁদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। স্বাধীনতা পূর্ব যুগ থেকে কাজ আরম্ভ হওয়া সত্বেও আমাদের নির্মীয়মাণ মিলনায়তনের নির্মাণকাজ এখনও দুঃখজনক ভাবে অসমাপ্ত। যদিও গণপূর্ত বিভাগকে ১৯৭৬ সালেই উক্ত নির্মাণ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। হয়ত বিভাগীয় লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে আমাদের আবেদন নিবেদন খুব একটা কার্যকর হয়নি। তবুও আমি না বলে পারি না যে, মিলনায়তন ছাড়া, এ ধরনের একটা বিদ্যায়তনের অনেক কার্যক্রমই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। তাছাড়া একটা মসজিদ এবং একটা সুইমিং পুল এখন আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তদুপরি একটি হোস্টেলের দোতলা নির্মাণের কাজ অর্থাভাবে এখনও অসমাপ্ত রয়েছে। কাজেই, এ সমস্ত

অসমাপ্ত এবং অত্যাবশ্যকীয় নির্মাণ কাজের জন্যে দ্বিতীয় পাঁচশালা উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সরকারী অর্থ বরাদ্দের জন্যে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ অনুরোধ জানাই।

আমাদের এ স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ সময়-অসময়ের প্রশ্ন না তুলে এমনকি আর্থিক ও পারবারিক নানা বিপত্তির মোকাবিলা করেও হাসিমুখে যে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তা বাইরে থেকে অনুধাবন করা সহজ নয়। তাঁদের ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা; কঠোর পরিশ্রম ও সহযোগিতার ফল স্বরূপ আমরা লাভ করেছি এ স্কুলের যা কিছু সুনাম, যা কিছু সফলতা। আমি তাঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

সমবেত সুধীবৃন্দ, আপনাদের অতীব মূল্যবান সময় ব্যয় করে আজ আমাদের স্কুলে উপস্থিত হ'য়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন বলে আমি স্কুলের সকল ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমাদের কোমলমতি ছাত্রদের অনুষ্ঠানের সকল দোষত্রুটি আপনারা সস্নেহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধান অতিথি, আপনার অতি মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন বলে আমরা আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনার উপস্থিতি আমাদের সকলকে অসীম প্রেরণা দিয়েছে। আপনার মূল্যবান উপদেশবাণী আমাদের ছাত্রদের জীবনের পাথেয় হ'য়ে রইবে। আজকের দিনটি তাদের জীবনে যে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। আমি আপনাকে এবং উপস্থিত সকল সুধীবৃন্দকে আর একবার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

কর্নেল জিয়াউদ্দীন আহমদ
অধ্যক্ষ,
রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল,
ঢাকা—৭

২৮শে অক্টোবর,
১৯৭৯।

পরিশিষ্ট "ক"

রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল, ঢাকা।

ঢাকা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষাসমূহের ফলাফল

সন	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা			উত্তীর্ণের শতকরা হার	লেটারের সংখ্যা	মেধা তালিকায় প্রাপ্ত স্থান
		প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ			
১৯৭১	২১	২০	১	—	১০০	৩২	—
১৯৭২	২৫	২০	৫	—	১০০	৩৯	একাদশ (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)
১৯৭৩	৩৮	২৪	১২	—	৯৫	৪৬	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম
১৯৭৪	৫১	১২	১৫	১৫	৮২	৩৪	দশম ও পঞ্চদশ (বিজ্ঞান) অষ্টম (মানবিক শাখায়)
১৯৭৫	৪৪	১৬	১৫	৮	৮৮.৬০	৩২	—
১৯৭৬	৪৫	১০	২১	২০	৯২.৭২	৩৫	—
১৯৭৭	৪৮	১৬	২৫	৪	৯৩.৭৫	৪৯	প্রথম (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)
১৯৭৮	৪৭	২৬	১৪	৭	১০০	৫৭	—
১৯৭৯	৫৩	২৪	২৩	৪	৯৬.২৩	৭১	ত্রয়োদশ (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)

পরিশিষ্ট "খ"

রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল, ঢাকা

ঢাকা বোর্ডের উচ্চ-মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষাসমূহের ফলাফল

সন	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা			উত্তীর্ণের শতকরা হার	লেটারের সংখ্যা	মেধা তালিকায় প্রাপ্ত স্থান
		প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ			
১৯৭১	৩৫	৩৫	—	—	১০০	৪০	—
১৯৭২	৪০	২৭	১৩	—	১০০	১৬	—
১৯৭৩	৬২	২২	৩৮	১	৯৮·৩৮	৩	—
১৯৭৪	৪৯	১৬	১৯	১৪	৯৬	৬	প্রথম ও নবম (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)
১৯৭৫	৫৭	৬	২০	১৬	৭৩·৬৮	৬	তৃতীয় (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)
১৯৭৬	৪৭	১০	১৮	৬	৭২·৩৪	২	—
১৯৭৭	৩৭	২৭	৯	১	১০০	২৮	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ষষ্ঠ, সপ্তম, ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ স্থান এবং মানবিক শাখায় ষষ্ঠ স্থান।
১৯৭৮	৩৭	৩০	৪	২	৯৭		সম্মিলিত মেধা তালিকায় চতুর্থ ও নবম।
১৯৭৯	৪৮	৩৯	৯	—	১০০	৪২	সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ, দ্বাদশ ও দ্বাদশ এবং মানবিক শাখায় তৃতীয়।

পরিশিষ্ট "গ"

সন	লাইব্রেরীর বই হারানোর সংখ্যা	গাড়ী রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যয়	ঘাস কাটার খরচ	ঘাস বিক্রি হইতে আয়	ক্রোকারিজ ভাঙ্গার সংখ্যা
১৯৭২	১০২১	৫৪,০৮০ টাকা	৩,৮০১ টাকা	X	১৬৭৭
১৯৭৩	১৮৬	১,০২,৭৪৪ টাকা	২,০৬৪ টাকা	X	১৬৩৪
১৯৭৪	২০৫	১,১৬,৭৩৯ টাকা	২,৪৬২ টাকা	X	১৯৮৮
১৯৭৫	১৮৯	৬৪,০৪০ টাকা	৩০৫ টাকা	X	১৪৫৪
১৯৭৬	১০	৭২,৬৮০ টাকা	X	৬৩০ টাকা	১৩৭৬
১৯৭৭	৭১	১,১৫,২৭০ টাকা*	X	১১৪২ টাকা	১২৪৪
১৯৭৮	৪২	৯১,২১৫ টাকা	X	১৮৮০ টাকা	১২২৩

* দ্রষ্টব্য : ১। প্রতি গ্যালন পেট্রলের মূল্য ১৯৭৫ সনে ৯.৩৭ পয়সা হইতে ১৪.৬১ পয়সা এবং ১৯৭৬ সনে ১৪.৬১ হইতে ২১.০৯ পয়সা বৃদ্ধি হয়েছিল।

২। ১৯৭৭ সনে স্কুলের বড় গাড়ীটি প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করে ওভারহলিং করতে এবং ছ'টি টায়ার কিনতে হয়েছিল।

পরিশিষ্ট "ঘ"

রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল, ঢাকা

ছেলেদের জন্য হোস্টেলের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা, ১৯৭৯

দিন	সকালের নাস্তা সকাল ৭টায়	টিফিন সকাল ১০॥ টায়	দুপুরের খাবার বেলা ১টায়	বৈকালিক চা বৈকাল ৪টায়	বৈকালিক দুধ সন্ধ্যা ৫॥ টায়	রাত্রি ৭॥ টায় রাত্রের খাবার	মন্তব্য
রবিবার	পরটা ও ভাজি কলা—১টা ডিম—১টা দুধ—দুই ছটাক	চা-বিস্কিট	ভাত ডিমের তরকারী ডাল লেবু/সালাদ	চা	দুধ দুই বিস্কিট	পোলাও ছটাক মুরগীর কোরমা, রেজালা, আলুর চপ, পুডিং, সালাদ/লেবু	প্রতি খাবারের (Meal)-এর
সোমবার	মডার্ন রুটি—৪/৫ পিস (মাখন এবং জেলীসহ) কলা—১টা ডিম—১টা দুধ—২ ছটাক	চা কলা	ভাত মাছের তরকারী ডাল লেবু	ঐ	ঐ	ভাত মুরগীর মাংস ডাল সালাদ/লেবু	নির্ধারিত পরিমাণ (ছাত্রপ্রতি) ১। খাসির মাংস—১½ ছটাক ২। মুরগী—৮ ছটাক ৪জন ৩। মাছ—১ ছটাক ৪। তরকারী ২ ছটাক ৫। মডার্ন ব্রেড জুনিয়র শাখা
মঙ্গলবার	ঐ	চা সিঙ্গারা	ভাত ডিমের তরকারী ডাল লেবু	ঐ	ঐ	ভাত খাসির মাংস ডাল সালাদ/লেবু	প্রতি ৪ জন—১টা সিনিয়র প্রতি ৩ জন ১টি ৬। মাখন ১পাঃ ৬৪ জন ৭। জেলী ১পাঃ ২৫ জন
বুধবার	পরটা সুজি হালুয়া কলা—১টা ডিম—১টা দুধ —২ ছটাক	চা বিস্কিট	ভাত খাসির মাংস ডাল লেবু	ঐ	ঐ	ভাত মুরগীর মাংস ডাল সালাদ/লেবু	**এক নজরে** মুরগীর কারী—৪ বেলা খাসির মাংস—৪ বেলা মাছ—৪ বেলা ডিম—২ বেলা
বৃহস্পতিবার	মডার্ন রুটি (মাখন এবং জেলীসহ) কলা—১টা ডিম—১টা দুধ—২ ছটাক	চা কলা	ভাত মাছের তরকারী ডাল লেবু	ঐ	ঐ	ভাত খাসির মাংস ডাল সালাদ/লেবু	পোলাও-কোরমা প্রতি সপ্তাহে—১বার নাস্তা প্রতিদিন তিনবার
শুক্রবার	পরটা সুজি হালুয়া কলা—১টা ডিম—১টা দুধ—২ ছটাক	চা সিঙ্গারা	ঐ	ঐ	ঐ	ভাত মুরগীর মাংস ডাল সালাদ/লেবু	
শনিবার	মডার্ন রুটি (মাখন এবং জেলীসহ) কলা—১টা ডিম—১টা দুধ—২ ছটাক	চা বিস্কিট	ঐ	ঐ	ঐ	ভাত খাসির মাংস ডাল সালাদ/লেবু	

ENGLISH SECTION

THE GREEN VALLEY OF LIFE

Golam Samdani
Class—XII Sc.
S. No. 2499

Indeed a wave of serenity and gracefulness stalked through my heart as I entered the R.M.S. compound verdant with eye-soothing greenness; and this is called 'to be charmed at the first sight'. I happily recollect, I was duly welcomed as a new intake of the then Annexe House. I felt, as if, I were landed in a vortex of mirth, pleasur and liveliness. Since then R.M.S. produced herself before the photographic mirror of my perspicacity.

Veritably speaking, I wondered when I found myself in the galaxy of so many booming itellectuals, Yes, R.M.S. can rightly claim to be a spawning bed of so many scintillating geniuses. The thought of a keen competition, I am to admit, loomed large upon me. Yet I was happy to think, had found a splendid opportunity to my potentialities with the touch-stone here at the arena of competition. Presently, I realize, success was (?) awaiting me.

Now it is time for me to point out the accessories peculir to R.M.S, that contribute to the overall development of the body and soul of a new intake.

The honourable teachers of my college are like widely sprawled banyan-trees in the boulevared leading to our progress. The storm of adversity often shrivel them up, but we are always safe and sound under the umbrella of protection. When and where we are last in the labyrinth of problems, we wonder to see our venerable House-tutors and reverend Housemaster standing by us extending their helping hands. When we are embasomed in the blinding gloom of despair in the College-Hospital, we find the House master cheering us up with his sterling bedside manner, Similarly. in every sphere of

activity, we are provided with the parachute of their directions cemented by the multitude of tender affections to evade the eventual chance of accident tending to retard our progress Zionward.

In the academic life, the spontaneous and energetic undertaking of our veteran teachers produce a disintegrating effect resulting in the development of the receptive power of our interllect. Anywhere, at any time and with any problem, to them we have an easy and cordial access. Now the class-room, we revere them as ones second to father and then as humorous and frolicsome friends in the play-ground where they buoyantly play with us exposing their innocuous juvenility coupled with underlying inherent childlikeness. Thus, in every sphere of activity they extend us the most enioyable companionship

This institution corroborates that mere succes in the field of education in no way may be the sole criterion of real success in iife. Success in edcation is only half the battle of life. Hence, this institution arranges Annual camping, Weekly pleasure trip or educative excursion and what not.

During Annual camping we come in the closest communion with Nature. Temporarily, we resort to the lap of Nature to get rid of the din and bustle of city-life. Besides this, we have the savour of camp life practising independence and self-help and thus the college provides us with the passport to the world where the fittest alone is the survival,

In the weekly educative excursions, we not only come to know about the places of historical interests, but also can broaden the compass of our knowledge, Sometimes, we visit Associations or Corporations meant for imparting scientific know-how to the general folk. Thus these excursions broaden the horizon of our empirical experience and practical knowledge.

Above all the scene of the play-ground at evening is the most attractive and soul-enthralling one. Every player irrespective of the teacher and the student strives desperately to score a goal and be the "HERO" of the day. Thus the lymphatic humour accumulated through sedentary activities during the day is excreted of in perspriation. At length, however, the haif-discharged storage-battery of energy is recharged with the nutritious tiffin.

At dusk, we as usual say our 'Magreb' prayer in congregation at the Prayer-room and then we are solely busy at the reading-table.

This period goes by the name 'Night study-hour' when our respected teachers as in the routine loiter up and down the corridor invigilating us. Is not it a unique prerogative ? This is one of the instances how the regimentation bridles up our promiscuous freedom.

Are you now impatient to be cognizant to my identity ? Yes, I am a nightingale singing in this green valley. I have flourished here and derived the nourishment from this valley gloating over this greeness rare in this dazzlingly rather white world. By God, I swear to sing in praise of Residential Model School as ever and for ever.

"I may disapprove of what you say, but I shall defend to the death your right to say it."

—***Voltaire***

THE REPORT OF THE EXCURSION TO SONARGAON ON THE 15TH OCT. 1978

Mustaque Ahmed

Class XI (Hu.)

S. No, 2304

It was the Sunday morning of the 15th Oct. We mustered strong at the facade of house No. 3, under the leadership of our honourable teachers, Mr. Mustaque Ahmed and Mr. Helaluddin Ahmed. 8 A.M. and our school omnibus chugged out.

When we sat in the speedy coach which was proceeding towards the important historic place of Sonargaon, the English song of Mr. Helaluddin Sir, the pop song of Tahsimur Rahman, the folk song of Mafiz, claps, hue and cry etc. filled our jubilant and juvenile mind.

A few minutes had elapsed since we arrived at evergreen Sonargaon and proceeded on foot together. At the outset, we travelled in the realm of historic art and sculptors of the Sardar Mansion which made us brood over the cultured bent of mind of the ancient Kings.

The village of Sonargaon is an attractive one. We saw many many beautiful butterflies fluttering. When we were walking she offered us a charming spectacle with her profound serenity and thus, we enjoyed the poetry of rural Bangladesh. Many buildings, small and large, were standing there like an eye-witness of history. We walked further and got into Folklore Museum, where we saw dice of country cake, clay models, little puppets, earthen snake and later on, we saw a lot of birdcages, multi coloured fans and "Nakshi-katha", and many other things. We are proud of all these articles, collected from different parts of Bangladesh, which bear testimony to the national glory and tradition.

Afterwards we had the glimpses of Gopinath Vaban established 1305, Poddar Bari, art gallary, ponds, the relics of some buildings, grave-yards which are stituated beside the ancicnt capital road and still the "Baro-Bhuiyan" are living in all these particles of Sonargaon.

Soon we got tired. The sun was in the mid-pocket of the sky. We took our tiffin consisting of butter bread, sweets, cheese, bananas, biscuits, etc., which stimulated our salivary glands and we gulped those to our hearts content. 12 p.m. and again we boarded the coach. We bade farewell to Sonargaon.

Lastly we owe a great debt of gratitude to the school authority for this educational excursion. This excursion will go a long way in building up the frame of our practical knowledge of history and indeed it has opened up a new vista of our knowledge. We want more and more excursion so that we can jump out of the heaps of the books to the practical field.

"The human being is, unfortunately, a creature endowed with free-will, and if for any reason, individuals do not choose to make it work, even the best civilization will not produce the result it was intended to produce."

—***A. Huxley***

THE BAFFLING INTERIORS OF ATOMS— THE BASIS OF MATERIAL CREATION

Shams Ahmed Zia
Class—XII Sc.
S. No. 2160

"What everything is made of ?"—"Why, atoms, of course" is the obvious answer of a child who has had atleast his primary schooling. "Father, today is the 6th August, you know, the first atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945 this very day," is how a boy in his early teens reminds his father of the tragedy. The word 'atom' itself has been so familiarised to us in this century that people, in general, may hardly canceive the stupendous phenomena of the atomic core which indisputably is the structural basis of the material world.

Atom's Structure: Atoms are submicroscopic structures, beyond the range of any visibility aided by the highest possible magnification. In fact, a hundred million of atoms in a row will describe a length less than half inch. So obviously they had to be conceived, deduced and modelled from bits of experimental findings. Theoritically atoms are the physical units of all and every element, all of them which constitute the familiar material world. Atoms mark the last limits of element's fractionisation i,s. 'atom', a derivative from its Greek root meaning 'indivisible', is the term for the smallest possible portion of the elements. So whatever we see and feel are but the complex aggregation of atoms.

The concept of atoms has a history which dates back to the periods of the ancient Hindu and the Egyptian civilizations. But little really was known about the atoms till 1890, when the idea of atom's indivisibility was finally rejected. From subsequent test results, that year, scientists theorised that atoms, in general, consisted of tinier sub-atomic fundamental particles of great numbers, and kinds; that atoms could also be splitted up into the constituents. But the fact remained unaltered that once divided, atoms no longer carried their elemental characteristics, that they were no longer atoms.

The 1890's test results were, undoubtedly, the beginning of the scientific knowhow, a successful probe into the dark world of atoms—and it ultimately paid off . Now it is established that the atom has a nucleus—a combination of two main particles—the protons and the neutrons, both of same mass. Orbiting this nucleus at tremendous speed, are another kind of particles, rather interesting ones—the electrons. These electrons orbit round the nucleus much as our earth orbits the sun in the solar system.

Later experiments, revealed a curious but interesting fact that the electrons and the protons are both electrically charged—the former negatively and the later positively, while the neutrons are not charged at all. They are neutral. The phenomenon is better understood by taking a magnet and a plastic body. Then the protons and the electrons are like the two magnetic poles and hence they attract and repel opposite and identical particles respectively. The neutron is like the plastic body and so does not interfere with or is not interfered by the effects of other particles as far as mutual attraction is concerned.

Of the three particles, the electrons are the lightest having a mass of 1/1800 the of those of the protons. And the mass of a proton ?—Naturally very small. In mathematical terms the mass of nearly 27,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 (25 zeroes after 27) protons sum up to a mere one pound. So these conventional units like pound, grams are too hazardous and impractical to weigh the atomic particles. So the proton mass is taken to be 1. The electron mass relatively is absolutely negligible and hence is taken to be O. The mass of an atom is, therefore, only its nucleus. So if the electrons can be dislodged from the nucleus, like they really are by the intense heat generated in the solar core and in other hot stars, there will be an instant atomic collaspe and a volume reduction of a mass that remains the same. It is rather hard to buy that. If similar a thing happens to the earth, this planet will shrink to a sphere with only one mile radius and yet weigh the same.

Anti-Matters: On a pleasant day of late 1932 Carl. D. Anderson, the American Plysicist was experimenting with the cosmic ray. Quite co-incidentlly he detected a particle, strikingly identical to the electrons in all aspects but one. It was charged positively unlike the negative electrons. These were exactly the anti-electrons or Positrons as they were termed, which were mathematically theorised by P. Dirac a couple of years before. The remarkable works of these two Nobel prize winners gave the motivating impetus necessary for

the discovery and separation of anti-protons by Shegri and Owen Chamberlain, joint Nobel Prize winners of 1959. The anti-protons, as can be expected, are identical with the protons but are oppositely charged.

Later the anti-neutrons were also found. These are electro-neutral like the neutrons but still are opposite. Actually all the particles execute a rotational motion about their axises which bring about a magnetic field with a definite direction. These directions are opposite in a particle and an anti-particle. The neutrons and the anti-neutrons have opposite magnetic fields though they are both neutral. But after many years of research works, relatively little is known about the riddles of antiparticles. For the problem is, particles and anti-particles can never co-exist. Their combination results in a total mutual annihilation—destruction out of material existence and only in a millionth fraction of a second. So working with anti-particles is extremely hazardous if not impossible.

But since they do exist, existance of anti atoms is very very possible' under conditions yet unknown to us. And hence, as it may be surmised, the feasibility of antimatters are rather high. Anti-matters which, however specutalive as it may seem, have 'existence' quite opposite to that of matters. But in practical field anti-matters are rarely, if ever, found and in laboratory, were only partially produced —as a combination of anti-protons and anti-neutrous only. But as scientists have every good reason to believe that both the kinds of matters exist in equal amount, it accounts for the scientists' conviction that in/fact there are two worlds or so to say two of everything. A world of ours of mainly matters and another anti-world of mostly anti-matters. For the two worlds are locked in a distance or time dimension—we don't find the anti-world. The interesting features of anti-matters, which are still open to research, are already the basis of many a up-to-date sciencefictions—we wait, till they become science.

Atomic Reaction ; How It Is done : The greatest of the unparallel scientific feats that the 20th century has to present is perhaps the Atomic Reaction that enabled the 'Little Boy' (code name of the first atomic bomb used in war) vapourise Hiroshima into the Mash-room or the Nautilus U.S. Nuclear Submarine dive under the Arctic ice-cap.

The basic precondition of the atomic reaction remains in the bombardment of the atomic nucleus with the particles like proton, neutrons etc. This being done, the bombarded atoms of rather

higher masses as the Uranium atoms are broken down into those of the smaller masses as Lead atoms, having suffered detraction is total mass. The mass, so reduced, radiates out as the atomic energy in accordance with Einstein's famous deduction of $e=mc^2$, where m is the mass reduced and c the velocity of light.

As for the 'missile' particle to bombard with, neutron is prefered most for its neutral charge, which gives it a remarkable cruising ability through the magnetic fields of protons and electrons of the target-atom. Any charged particle rocketing through these fields will definitely be off the course on a trajectory missing the nucleus, the target.

As a neutron 'splinter', cruising at considerable velocity, zeroes in at an atomic nucleus the intruder is instantly engulfed by it. But the neutron does its part of damage. It plainly knocks out two or more neutrons at high velocity along with a little energy release. These exiled neutrons soon seek out their victims—the adjacent atoms. The feat repeats itself and, when subjected to recurrency, brings about the Chain Reaction or the 'Atomic Fission'. This fission works the miracle of the century. The little energy released during each reaction sums up to an unbelieveable energy radiation equivalent to the explosive powers of thousand megatons of T.N.T. This stupefying energy can wipe out a city like Hiroshima or can induce a sub-marine into a non-stop propulsion through half a decade, depending on how this energy it is used. For mankind's sake, it better be for the good.

●

"The child is a book which the teacher is to read from page to page.

—***Rousseau***

REPORT ON THE EDUCATIONAL EXCURSION :

To the Bangladesh Council of Scientific and Industrial research Laboratories, Dacca.

Humayun Kabir
Class—XI
S. No. 2481

When we stepped into the compound of the B.C.S.I.R. Laboratories, it was 10.45 A.M. Our hearts were throbbing with the inquisetiveness to wade through the world of science. Needless to say, The B.C.S.I.R. Laboratories along with the Atomic Energy Commission, is playing a vital role in the realm of scientific reserch in Bangladesh. Nature with her bountiful hand has enriched each and every country. Through scientific research we are to make the optimum utilization of our indegenous resources.

Before we started go round the projects of the B.C.S.I.R. Laboratories, we fell in two lines and were divided in two groups. We numbered 44 excluding our respectable teachers,— Sk. Md. Omar Ali, Mr. Mustaq Ahmed, Mr. Ataul Hoq and Mr Abdul Alim. The official who accosted us highly lauded our disciplined behaviour.

First of all we were taken to the Jute research section where many new and modified uses of Jute, that have been achieved, were exhibited. There included substitute for corrogated iron sheet, Jutton Cloths salour acided and others.

Next we entered the medicine section where we learned how very many important organic compounds and alkaloids were extracted from plants that we trample under our feet whimsically.

From thorn apple seeds or namely Dhutura seeds, cure for neo-lunatics can be prepared and research is still going on. From Mohun flowers 38.8% of stearic acid has been extracted, which is the fundamental component for powder and snow.

There on we visited sections after sections and learned how milk is prepared from beans, (the importance and prospect of earthen ware pieces of arts, how solar drier can be made from indegenous

cheap materials and its utility.) we also observed with keen interest the solar reflector in miniature and the bio-gas plant which yields 100 cft. of gas fuel from 60 K.g. of Cowdung every day and which is sufficient for cooking for a family consisting of not more than 7 members. We then visited the leather section which had varieties of tanned leathers. Then we were led through the food preservation section. This section has done a lot of impressive research works in fruits and vegetables preservation. Particularly it is important in a tropical country like ours.

There form we returned to bus at 12.00 and we set out for our school at 12.20.

Thus ended our second educational excursion in a month with the lapse of only 9 days.

Our visit to the B C.S I.R laboratories has opened up new vista of knowledge and has stimulated our searching minds to contribute our mite to the onward march of our motherland in the field of science of technology. We would therefore look forward to more such pleasant visits.

●

"Teaching is a joyous adventure just because the teacher is even a learner."

The Golden Age of Greece

Ashfaque Mansur
Class—X Sc.
S. No. 1171

Perhaps it is known to all of us that Greece was the cradle of civilization. When the Britons of today were groping in the darkness, the Greeks were basking in the sunshine of civilization. A wonderful civilization flourished there. Greece was blessed with many philosophers, scientists, poet, builders, artists, rulers and sculptors who contributed towards the rise of that civilization. Pericles was one of them who dedicated himself to the welfare of the country.

It was during the time of Pericles that the Greeks attained the pinnacle of prosperity. He was truly a great man. He was not only wise but also a ruler of the first water. He was a great patriot. To serve the country was the be all and the end all of his life. Though he was born with a silver spoon in his mouth he used to consider himself as other ten of the society. So he was able to find out what the common people thought and wanted. It was during his time people were given their rights in government. For the first time men who helped in governing the city were paid for their work. This enabled the poor to take part in their government. The people had faith in Pericles so much that they kept him in his office for thirty years. This period is known as the "Age of Pericles" and as the "Golden age of Greece." During the "Age of Pericles" Athens became the most important city in the ancient world. Its navy was more powerful and its trade was larger than that of any other city. Pericles was an ardent lover of beautiful things. He loved Athens and wanted to make it beautiful. For this reason he asked the people to spend money for fine buildings. This they did. And as a result fine building and temples started coming up. Of these temples, the most beautiful was the Parthenon. It was built in honour of Athena, the goddess of wisdom on Acropolis a rcky hill in the centre of Athens. Pericles also had a splendid theatre built on Acropolis. This theatre was so large that it could accommodate all the freemen in the city at a time. Besides its altars, its temples and other beauti-

The Golden Age of Greece

Ashfaque Mansur
Class—X Sc.
S. No. 1171

Perhaps it is known to all of us that Greece was the cradle of civilization. When the Britons of today were groping in the darkness, the Greeks were basking in the sunshine of civilization. A wonderful civilization flourished there. Greece was blessed with many philosophers, scientists, poet, builders, artists, rulers and sculptors who contributed towards the rise of that civilization. Pericles was one of them who dedicated himself to the welfare of the country.

It was during the time of Pericles that the Greeks attained the pinnacle of prosperity. He was truly a great man. He was not only wise but also a ruler of the first water. He was a great patriot. To serve the country was the be all and the end all of his life. Though he was born with a silver spoon in his mouth he used to consider himself as other ten of the society. So he was able to find out what the common people thought and wanted. It was during his time people were given their rights in government. For the first time men who helped in governing the city were paid for their work. This enabled the poor to take part in their government. The people had faith in Pericles so much that they kept him in his office for thirty years. This period is known as the "Age of Pericles" and as the "Golden age of Greece." During the "Age of Pericles" Athens became the most important city in the ancient world. Its navy was more powerful and its trade was larger than that of any other city. Pericles was an ardent lover of beautiful things. He loved Athens and wanted to make it beautiful. For this reason he asked the people to spend money for fine buildings. This they did. And as a result fine building and temples started coming up. Of these temples, the most beautiful was the Parthenon. It was built in honour of Athena, the goddess of wisdom on Acropolis a rcky hill in the centre of Athens. Pericles also had a splendid theatre built on Acropolis. This theatre was so large that it could accommodate all the freemen in the city at a time. Besides its altars, its temples and other beauti-

ful buildings, the Acropolis was famous for its beautiful statues. Some of the best of these were statues of the goddess Athena carved by the great sculptor Phidias. One of them was about seven times as high as a grown man and stood inside the Parthenon. The face, hands, and feet were made of ivory and the dress of glistining gold. Another large statue of Athena stood near the entrance to the Acropolis. It was nearly twice as high as the statue inside the Parthenon and could be seen by the sailors far out at sea. Greek art of every kind was at its best during the Age of Pericles. No other people have ever excelled the Athenian artists of that day. Some of them made beautiful vases, bowls, jars and other kinds of pottery. These were usually decorated with paintings. Many Greek potteries have come down to us and may now be seen in the museums of the world.

Although we no longer have any of the pictures which the Greeks painted, we are told that they were exquisite. We know Phidias was the greatest of all the Greek sculptors. Besides his famous statue of Athena, he also carved a large statue of Zeus and Aphrodite. Unfortunately, his statue of Zeus, which came to be called one of the "Seven Wonders of the Ancient World," has been destroyed. The statue of Aphrdite is one of the most famous in the world today. Another well known Greek statue is called the "Winged Victory." Although the head and arms have been lost, it is still beautiful.

It was not only Pericles but also Socrates, Plato, Aristotle, Alexander, Demosthenes and many others who made Greece beautiful and the most civilized nation in the world. It was durig the time of Pericls that the poems of Homer were preserved for the first time. The wonderful civilization was the outcome of all that was the best and in all spheres of activities the Greeks of those days showed their excellence and built the wonderful civilization.

DARKNESS AT NOON

Kamrul Hassan
Class—XII (Sc.)
S. No. 2464

The dim light of the table lamp had created an enchanting atmosphere around the table. Few insects were circling around the spectrum of light. Syed was going through a novel of Saul Bellow with undivided attention when he was called for dinner. Pushing the chair behind, he tried to stand on his feet . Suddenly he stumbled and fell towards right side. Blancing his body Syed got hold of the corner of the table. He just managed to avoid the collision of his cheek with table. And just at that moment he called to mind the crutches.

Really, such sort of things take place, especially when a person loses his eye sight by an accident, when the colourful world slams all the doors hiding the plethora of beauty from his sight. Still on waking from sleep every morning the person tries in vain to view the familiar world. With the year the seasons return but not to him returns the sweet approach of evening or morning or sight of vernal bloom or summer's rose or human face divine. The anguish of Syed is not different from this.

The halcyon days of his childhood crowd upon his mind. While going anywhere by boat Syed would let his legs fall into the water. The cool touch of the water would fill the mind of Syed with unspeakable delight. Uncle Nawab used to say, Sadu, why do you touch water ? The sharks will bite you". Out of fear Syed would take away his feet quickly and check whether they were unhurt still. The boy would imagine a black ferocious animal with sharp teeth criss-crossing through the water to amputate his legs and that would send cold shiver through Syed's marrow.

The black wheels of the speedy truck amputate the right leg of Syed as if they were the sharp teeth of shark. Syed had fainted instantly, otherwise the sight of the blood-stained body would have run him off his head.

After a few days, Syed returned home raising a creaking sound on the mossaic floor of the hospital. At first everybody got astonished, showed sympathy to him. And then ? Then in the inexorable law of the world everybody forgot him. No one would share his pain, because in bearing pain one is always alone.

At times Syed feels like throwing away the crutches and jumping in front of a rushing truck. He wanted to cry out, "Crush me under your feet as you wanted to". He hates the crutches from the core of his heart. Like two Argus eyed sentries, they guard him all the time.

Yasmin's eyes were puffy in suden shock and tears rolled down her rosy cheek when she first saw Syed in the new perspective. Seyd hesitated to meet her as he was paralyse by a sense of inertia. He could easily realize the indifference that than dwelt in the sparkling eye of his fiance where once love twinkled delightfully. The world became darkened for him. It seems as though everyone had been giving a cold shoulder to him.

A sense of isolation grew in Syed and he gradually retreated into his own shell. In the mean time few years elapsed. For Syed, Yasmin was dead. Her memory totally slipped out of Syed's heart.

Syed got release from the iron detention of his crutches by the magic touch of plastic surgery. If one does not scan Syed's movement, one will be disillusioned to belive that Syed in a perfect man like anyone else.

Syed's mother was up and doing for his marriage. She did not even wait for Syed's consent. Yet he could not resist Sohanas entry into his life. Syed had no intention to envolve anybody else in his wretched life and shatter the dreams of an innocent girl and bring her to an utter disappointment that her husband is a lame man.

Syed got startled when he stepped into the bride's chamber. Who is there siting on the fringed and tasselled bed ? He approached her in a haste. While trying to sit quickly on the bed his right leg hit against the woodenstand. It surprised the bride. She turned her neck in surprise. Syed looked at her straight. No, she was not Yasmin. Syed came back to his senses.

The next day Syed tried to avoid Sohana on the pertext of other business. After dusk he returned to his room. Sohana was sitting on a green couch. Clad in the golden embroideded red sari, she looked like fairy from a never never land. Syed walked very slow

and cautiously. Still he could not bend towards right side slightly. Sohana was scanning his movement carefully. Her guess then turned to faith and her heart was petrified in great shock.

"What happened ? It is dark and you are here sitting alone and I think a little depressed"—Syed asked his wife in a trembling voice.

Sohana raised her face and looked at her husband. The young man's voice sounded like her old grandfather. During her childhood she mocked at him calling him a "lame". Then looked at herself. It was not she, Sohana, the newly married, beautiful, young lady but her old grandma occupied her place.

And at that time a current of intense pain knifed through Syed's heart. There was darkness at noon.

FREEDOM YOU ARE

Original : Shamsur Rahman
Translated ; Azfar Hussain
Class—XII Hu.
S. No. 2491

Freedom you are
the juvenile poems of Tagore the immortal songs.

Freedom you are
Qazi Nazrul, his flaunted shaggy neck-slinging hall
the great man, shivered in the exhilaration of creation

Freedom you are
the lustrous meeting of Amor Ekushe Febrauay,
at the altar of 'Shaheed Minar'.

Freedom you are
the flag-embelished slogan-echoing pungent procession.

Freedom you are the peasant's smile in a corn-field.

Freedom you are
a free swimming rustic damsel in the mid
pond in a sun-baked noon.

Freedom you are
the swollen muscle of the sun-roasted arms
of a young labourer.

Freedom you are
the sharkle of the eyes of a freedom fighter
in a dark-deserted border.

Freedom you are
the scientillanting speech fired with words
of a young brilliant tyro under the shade of the Banyan Tree.

Freedom you are
the tampest in the teapot and in the fields.

Freedom you are
the intoxicated gust of horizon-ripping storm of 'Baishak'.

Freedom you are
the endless bosom of the Meghna in 'Sraban'

Freeom you are
the magnanimous embroidery of the soft 'Zainamag' of a father.

Freedom you are
the limpid 'saree' of a mother
spread out in the courtyard.

Freedom you are
the crimson-red of a sister's hand in a gentle leaf.

Freedom you are
the red posters ablaze with stars in the hands of a friend.

Freedom you are
the dishvelled dark-black velvety hair of a housewife,
wild and unrestrained in the wind.

Freedom you are
the scarlet shirt of a Babe
the rosy walts of sunshine on his soft and puffy cheek.

Freedom you are
the cottage in an orchard the symphony of a cuckoo,
the gleaming leaves of an old Banyan-tree
the manuscript of my poem as would I like to write.

(Published in the Bangladesh Observer)

THE REPORT OF THE EDUCATIONAL EXCURSION AT SAVAR DAIRY FARM

S.M. Shazada Alam
Class—X(Hu.)
S. No. 911

It was 2-15 P.M. when our school bus left the campus. Ours were the guiding companions like Mr. Mustaq Ahmed, Mr. Helal Uddin, Mr. A.B.M. Abdul Mannan, Mrs. D.R. Islam and Mrs. Chisti.

We reached the জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ and assembled in the compound. The sky was cloudy and soon it started drizzling. But braving the drizzling we paid tribute to the souls of the martyrs. Shahidul Islam and Qumrul Islam placed floral wreath there. Nazmul Kabir and Imtiaz Mahmud were busy with their cameras.

3-30 P.M. and we were at the Savar Dairy Farm. There we grouped into three and entered into ***Milk Pasteurisation Plant***. Thus we stepped into a new field of knowledge and came to learn, from the officials concerned how milk was pasteurised at 70'C and thus was freed from bacteria and other harmful microbes. Here the centrifugal force was effected for skimming the cream from the milk and a 3.5% of the cream was preserved in the milk in a proper proportion. Thus we had a practical idea of what we had seen, in co-operation with the officers. Then we visited the ***Seman Preservation Nitrogen Plant*** where the sperm of the bulls were stored in the freezing chamber in liquid Nitrogen at a very low temperature and thus were preserved even for 20 years. An officer explained the mechanism of Cross Breeding.

Afterwards, we entered the cow sheds and observed a number of fat and healthy cows with a sense of wonder mingled with national pride of this asset which still upholds our tradition. We were surprised at the unnsual size of the gigantic Australian bulls. We felt amazed at the contribution of science in respect of mechanical milking. At length we learnt how high-bred cows were produced and what a vital role they play in our national economy.

Then we regaled ourselves with a light refreshment arranged by the authority in courtesy of Mr. Nazir Ahmed, the Project Director. The sun was then in the western pocket of the sky. We had cold Pateurised milk, buttered loaves, tea and other sweets, which stimulated the salivary glands. We would like to extend our heart-felt gratitude to Mr. Nazir Ahmed, the Project Director, Mr. M.A. Salam, the Deputy Manager and the other section chiefs and officers who extended their maximum co-operation in every respect beamingly.

We returned to the school campus in the evening at 6-30 P.M. At length we invest the honourable Principal, the honourable Vice-principal, reverend teachers Mr. Mustaq Ahmed and Sheikh Md. Omar Ali with our cordial thanks and gratitude for such a salutary initiative as this. Thus our educational excursion reached the golden beach of success. We expect, from the authority, this type of steps which will go a long way in shaping our future in the world of know-how and broadening the horizon of knowledge.

●

TELEPHTHY

Sohail Hasnie

Class—XII. Sc.

S, No. 2508

(The word "telepathy" was formulated by" FREDERIC WILLIAM HENRY MYERS" an English poet, in 1882).

Telepathy is the direct communication from mind to mind by some means other than the usual senses. Telepathy is considered as one of the subclasses of extrasensory perception (E.S.P.). Psychologists carry out research on telepathy by analyzing reports of spontaneous cases—Records of what seem very strikingly to be instances of telepathy. Telepathic impressions may be vague or clear, simple or detailed. They may be over in a flash or last for minutes. Sometime the experiences come as a visual image and sometimes as a sound, perhaps of a voice. Sometimes the report is of knowledge without sensory imagery—for example, one says, "When the telephone rang I knew it was John, though I hadn't heard from him for months". Such experiences resemble hallucinations or delusions, and the mentally ill often mistakenly think their hallucinations are telepathic.

Investigators of such reports try to find if the experiences had been described before there was other information about the event and also if the event took place as reported. Many accounts have been authenticated, some of important or critical situations. Other cases involve trivial matters, as when a woman in Scotland believed she saw a friend wearing purple dress. She was astonished because she thought the friend was in England and she beleived the friend never wore purple. Later the woman learned that her friend had indeed been in London at that time and had been trying on a new purple dress, the first she had ever bought.

After authenticated cases are collected, two critical questions must be raised about them. Could the experience be explained by normal associations of ideas ? For example, might the woman in Scotland have suspected her friend was ready to buy something

radically different ? Might the apparent telepathy be only coincidence ? If, for example a mother "hears" her son calling her when he is in accident in a distant land consider how often she and other mothers have had similar experience when nothing was wrong ?

Laboratory Experiments :—Laboratory investigations seem to confirm that telepathy can occur. They also show that it is a weak ability in most people, and that it is hard or perhaps impossible for a person to be sure that a particular impression is telepathic. Experiments are conducted under tightly controlled conditions, in which the telepathic "messages" follow a random order, the sender and receiver are seperated so that there can be no sensory cues, and there is independent recording of what is sent and what is received. Results indicate that telepathy is more likely to be successful between two people who know and trust each other than between strangers, between two who have a good deal in common than two whose attitudes are dissimilar, and between warm, out going people than between hostile or reserved ones. It is also more likely to be successful with vivid, emotionally toned stimuli than neutral ones.

In most cases of what is called telepathy, the person may be responding to some object or event rather than to anyones thoughts about it, as in the case of a father away from home who had a sudden vivid image of his young son falling out of bed. He wrote to his wife and learned that the child had fallen out of bed at just about the time of his image. It is more than coincidence, it might represent a response to the event (clairvoyance) instead of to his wife's or child's thoughts (telepathy). Experiments have therefore been conducted in which there was no object record of the message. The sender translated the digits of a random number table into a private code, never witten or spoken, and then sent the message in code. These experiments have given results that cannot be explained by chance thus indicating the existence of "pure telepathy".

General E.S.P. Test :—In this test the sender shuffles and cuts a desk of E.S.P. cards and looks at the face of each card while the receiver attempts to read the mind of the sender and guesses the symbol on which the sender is concentrating. When one card is finished, the test proceeds to the next card and so on through the deck.

Distance Telepathy Test :—In the methods discussed above, the subject and experiments were in the same room. Some results were collected in which the subject and experimenter were seperated

by several rooms or by a considerable distance. A few experiments were successful in eliminating the hypothesis of chance causation of results when subject and experimenter were seperated by many miles.

Conclusion :—There is no good theory how telepathy occurs. It is sometimes suggested that brain waves from one person or animal may be picked up by another. This seems unlikely for several reasons. Brain waves of sufficient energy to give detailed information over long distances are not found by even the most sensitive instruments. Changes in distances have little effect upon telepathic accuracy. And such brain waves do not account for other forms of E.S.P. that closely resemble telepathy. All types of E.S.P. which seem to function intermittently, and are difficult to control or identify, show systematic predicable errors, and have more success with warmth, co-operative interest, and good rapport than with a mood of negativism, hostility or apathy.

THE SKY BECAME CLOUDY AGAIN

Md. Quamrul Islam
Class—XII, Sc.
S. No. 702

No sooner had I stormed into the Sylhet Railway Station than the Dacca bound down Surma Mail started chugging piercing the curtain of darkness. Fortunately the air conditioned coach came in front of me and somehow I managed to jump into the corridor. Heaving a sigh of relief I brought out my ticket and looked for my coupe number. It was A-2. After unlocking the door scarcely had I rushed into the coupe before a shrill cry deafened my ear—

"Aah. . Yee. Blind. You selfish guy, can't you see...... ?" A convent accent !

It was clear, while rushing inside I had inadvertently tramped over the delicate foot of the lone lady Passenger in the compartment. Before I had time to seek pardon the young lady was already out grumbling vociferously and was in desperate search of the attendant. She strutted towards the attendant's seat wafting au-de-cologne in the trail. Soon she was locked in a verbal duel with the attendent—

' How could you think of me travelling with that idiotic guy all the way from Sylhet to Dacca in the same compartment ?"

As she altercated with the attendant demanding an immediate change, the poor attendant tried to explain that he too favoured change but was utterly helpless. All the passengers in the air-conditioned coach were bound for Dacca and were already settled. Hence, there was no recourse for him to make any change.

As the other lone passenger of my compartment was carrying on the feminine battle outside to oust me from the coupe, in side I had nothing to do other than settling down. I tried to be cool and relaxed. Suddenly as I was about to go towards the bathroom for having a wash, the bold letters of a name attracted my attention. Casting a cursory glance I read it in a breath—

"Miss. Sonia Nasreen." Nice name indeed !

I was just pondering how the girl of such a sweet name could be so unkind to a fellow innocent stranger like me. Am I going to

make the journey with her ? At that moment came my fellow passenger. No doubt, she had lost the battle of ousting me and was boiling inside. So I won the first round ! Her rosy cheek blushed with anger. Before I had a chance to regret for my inadvertent misdeed (?) she crossed without caring a fig for me, went inside the coupe and slammed the door.

In the toilet I just had a clean wash which dispelled my langour. I brushed my long ruffled hair and came out. This time slowly and cautiously I opened the door to get inside lest I repeated the same crime (?). My female fellow-passenger was sitting placidly in a corner casting her eye at the darkness outside. She was clad in printed maxi with her bob-cut hair stretching upto the neck. A strange silence engulfed the coupe, only the jingling and clattering sound of the fast moving train was audible, Stations like Mughla Bazar, Majgaon, etc. had passed that time. Settling in the other corner of the coupe I broke the silence—

"Madam, I do really feel sorry for what happened to you. Believe me, I didn't do it deliberately—it was just an accident. In fact I was really in mad-rush and was about to miss the train."

She hardly paid me any attention, still I continued—

"You know the Keene Bridge, a place frequently in traffic jam. But my goodness, what worst turn it took tonight ! I just had my reservation and left for the station right in time. When we reached the Keene Bridge, fear engulfed me. We were amidst a sea of vehicles. I asked the driver to somehow get through offering a handsome perquisite, but he too was helpless. At last when we arrived at the station platform the train was whistling and the gaurd was showing the green signal. I don't know what I throw on the driver's hands and how I boarded the moving train. Believe me, I was in a terrible haste, I never stepped on to you intentionally; how can one do that ? I do sincerely atone for giving such a painful trouble to you."

But all my sincere attempts proved futile. Nothing could appease her. She was more than reluctant to agree that my misdeed was an inadvertent one. She remained tight-lipped, blaming me tacitly. The more I appealed for apology, the more she hardened her position. The only remark she had for me was, "I have already hard it, no more please." I felt utterly helpless. Perhaps even God would fail to placate her as nothing could soothe the offended state of her mind.

There was again silence in the coupe. I just took up a novel of Saul Bellow, "Dangling Man." At a time when I chanced to

look through the window pane, I found that my partner (?) in the compartment was also browsing through a Bombay Film Fare magazine. I doubt whether any of us was actually reading seriously. Rather it seemed more likely that we were hiding ourselves from each other. Outside the sky was getting cloudier and our train was piercing through the cold wind of the dark night.

When the train scruched to a halt at Langla station. I got down to buy cigarettes. I was sureprised to find that a place famous for the Nawabs of Prithimpasha couldn't provide me with a packet of triple-five. I had to return to my coupe being contented with a pack of Gold-flake. The train had just started when I lit one.

Hardly our train had crossed Shaistaganj when the rain came in torrent. It changed the monotonous rhythm of our journey. The clattering sound of the train and the music of the rain-drops mingled to create a dulcet and euphonic symphony. The falling rain-drops seemed to rule their backs at the window pane.

Suddenly the stillness and silence of the coupe was broken by a sweet feminine voice,

"It seems that this rain would never stop. How disappointing it is that Dacca will be welcoming me in such. a cold manner."

At first I thought I was dreaming. But when I raised my face I was starlted to see that my lone reticent fellow-passenger herself was speaking. She continued :

"This is for the first time that I am going to Dacca and shall be taking admission into the Holy Cross College. As I'll almost be alone in that new strange place I am afraid whether I shall have a nice time there. For I have heard that new intakes at the college are very often ragged. Despite this, how painful it is to think that Dacca will be receiving me so coldly. Don't you think that the rain would ever stop ?"

As she was narrating all these in one breath, I was hunting the world of reasons to find what made the frozen Everest melt so easily. Perhaps she felt helpless. For the first time I looked at her eyes and sureveyed her whole being. The young girl who only a few houres back seemed to be a virago now has miraculously turned into an unassuming and modest lady. Her eyes winked and an eternal brightness seemed to sparkle over her. She appeared very beautiful and innocent to me. I felt an intense urge for helping my helpless feminine fellow passenger and I said,—

"There is nothing to worry about. For it matters very little

even if it rains. Dacca has its unique warmth of heart to welcome you. Moreover, I believe this rain will stop before we reach Dacca. Its still a long way off.

The girl seemed to be quite assured and pleased. Her beaming face stirred in me the eternal truth that girls look the most beautiful not when they are rude or stern but when they show innocence and helplessness. To dispel her fear and doubts I said,—

"Oh, well, I can really help you madam. I have a cousin studying at Holy Cross College and she has great influence in the student community. I'll just tell her and she would make every thing O.K. for you."

She was more assured and nodded her head in approval, "Thank you very much. I can never forget your kindess and help." I couldn't gather what to say in reply. For it was far beyond my expectation that she would have so friendly words for me. I was indeed charmed by her beauty and conduct.

As the train left Akhaura our conversation took a new turn. It became warmer and friendlier as we talked about our likes and dislikes, hobbies and families. I do not know when I began to call her 'Sonia'. All the time she was very frank and discussed everything politely. I eulogized her when I learned that she could sing well. She only laughed with rippless spreading all over her face. Before reaching Brahman Baria we two to gether had coffee and some snacks. But Sonia wouldn't take much as she followed strict. diet control for maintaining her winsome slim figure.

Then our personal reserves totally crumbled down. Our discussion followed no routine track. It spread over a wide spectrum lurching from modern art, philosophy, latest continental and American literature to current Hollywood hits.; seeing my shrewd grasp on so many subjects she was virtually spellbound. I felt, as if, I were the on monarch under the sun.

Though wer resved sleeping berths, none of us had a wink of sleep. Only at the small hours of night we just lolled in the seat drowsying a little.

"Here... ...is... ...the Ittefak, Bangladesh Times.. ... ,—" with this shouting of the hawkers I came to my senses, lit up a cigarette and looked through the window pane. It was dawn and the station was Tongi. The rain had stopped and there was bright sunshine outside. I felt its warmth inside the coupe. I aroused Sonia and asked her to pack up her luggage.

A lapse of a few minutes and it was Tejgaon. After a short pause the train proceeded towards the final destination—Kamlapur. I pointed through the western window—

"Look, Sonia, your Holy Cross College is only a few yards from here. Had not the trees and skylines obstructed your views, you could have a clear view of your college campus."

"Oh ! I see, is it, is it so ?"—came the reply.

At the curve of Kaoran Bazar, I pointed towards the Hotel Intercontinental,—

"This is our Hotel Intercontinental our most luxurious and 5-star hotel. girdling it there lie Radio Bangladesh, P.G. Hospital and lush Ramna Green. I am sure you will like the Ramna Park. Perhaps we two someday will be strolling along the aisle of Ramna Park in a vernal evening."

At the end of the 180-mile long journey from Sylhet the Surma Mail was entering into Dacca platform like a gaint serpent. I, hastily brought out my blue diary, jotted down mine and my cousin's addresses and phone numbers. I had just finished when with a hissing sound the mammoth python come to a standstill along the platform.

Other passegers of our coach gradually got down. Sonia went near the door. Suddenly she waved her hands to somene shouting,—

"Hi, uncle, here I am, how sweet to meet you."

Ducking my head through the window I caught the sight of a man advanced in age just reciprocating Sonia's gesture. I hurriecly handed down my address to Sonia and I told her,—

"Sonia, I again assure you that I can really help you. I told you about my cousin at Holy Cross. Fortunately for you her birthday falls on the day after tomorrow. You just come down at my house and I'll take you to her house. We shall have a nice time together. Then, I can hope, you are positively coming ?"

Sonia frog-leaped on the platform with her bag and then looked back. Smilingly she said,—

"Thank you very much for your warm company. In fact, right from the beginning, I was ruling under a severe headache.

Had you not been there, the journey would have been a punishment for me. To tell you the truth, this is not the first time I am coming to Dacca, rather it is for the first time that I had been to Sylhet. Probably you don't know that my father Brigadier Abdullah has recently been transfered to Sylhet. He is the garrison commander of Sylhet. I was born and brought up in Dacca. I had gone to Sylhet only to meet my father during my summer vacation. O.K. Good-bye !"

Instantly she strutted out of my sight.

Each word of her epilogue pierced my heart like a bullet. My senses were paralyzed. Standing at the door of the empty coach I just cast my eyes at the sky overhead. Gone was the bright sunshine. The sky became cloudy again !

RELIGION AND ITS PLACE IN HUMAN LIFE.

A.B.M. Abdul Mannan Miah
(Lecturer in Islamiat)

Religion means a path, a way, "a path fixed or appointed by God," "a way of life prepared by God for the benifit of human beings". Religion is a part of human nature, and human beings can not live without it happily and peacefully. The absence of religion in a human being can be described as lack of humanity in him.

Religion is the natural demand of Man. Religion is something what human nature demands. There are three basic human needs : food, clothing and shelter. These are physical needs. Beyond those are spiritural needs as well which science and philosophy fail to satisfy. As the human stomach requires food; to protect it from cold & heat the necessity of clothes; the family life requires a home to live in. Human mind also requires certain things. Religion fulfils the spiritual requirements of man, by providing suitable answers to the fundamental human problems.

Religion is a Human necessity. Religion is a way fixed by God. The believers of God develop the qualities of brotherhood, unity, love, discipline, equality fraternity, kindness and justice. Man requires some help and guidance for lack of self confidence and after putting reliance in God, he is confident of his might. Religion presents a complete code of human life.

Religion is a universal truth. In all ages, in all countries, people of different races and colours, have accepted the guidance from Religion. Food, shelter and cloth fulfil physical requirements of man but religion alone fulfils the spiritual requirements of man and therefore occupies an important position in the basic human needs. When religion has ever been a part of human life since the creation of this universe it is clear that man needs religion in the same way as he requires food, cloth and shelter. The human soul can not be satisfied withour religion. The fundamental metaphysical problems of human life, cannot be solved by any other means except religion. The force of religion is eternal. From Adam to this day, religion survives.

পুরস্কার বিতরণী '৭৯

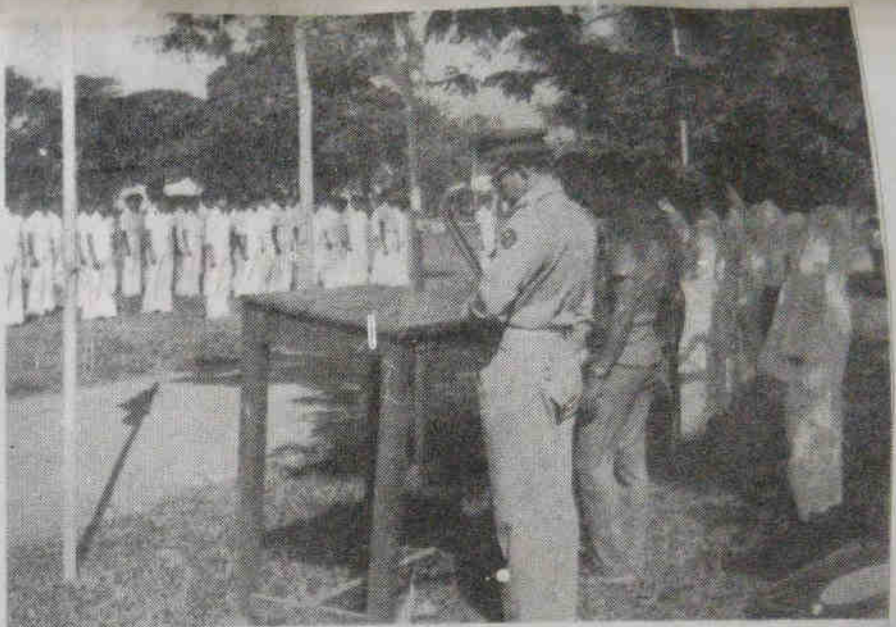

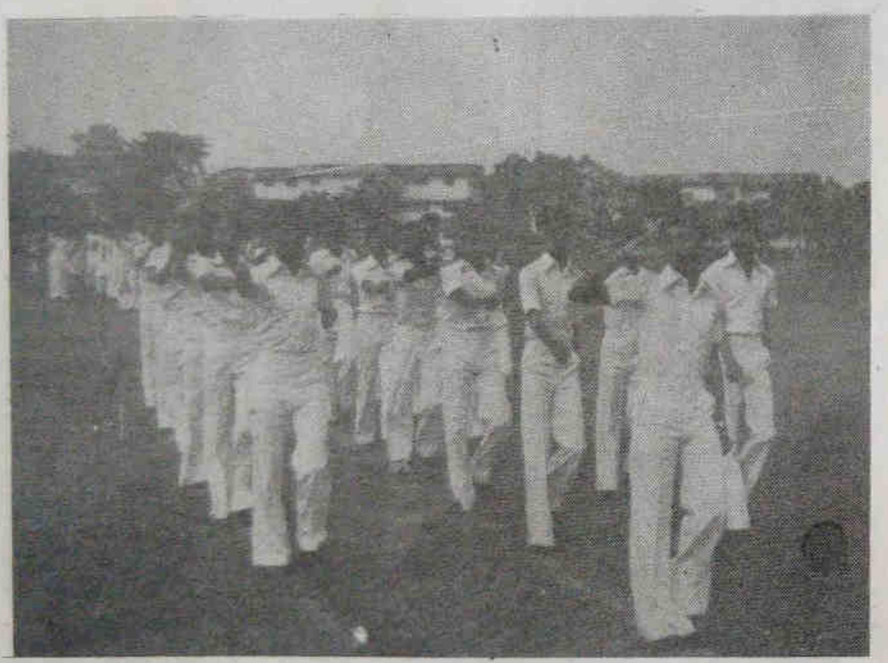

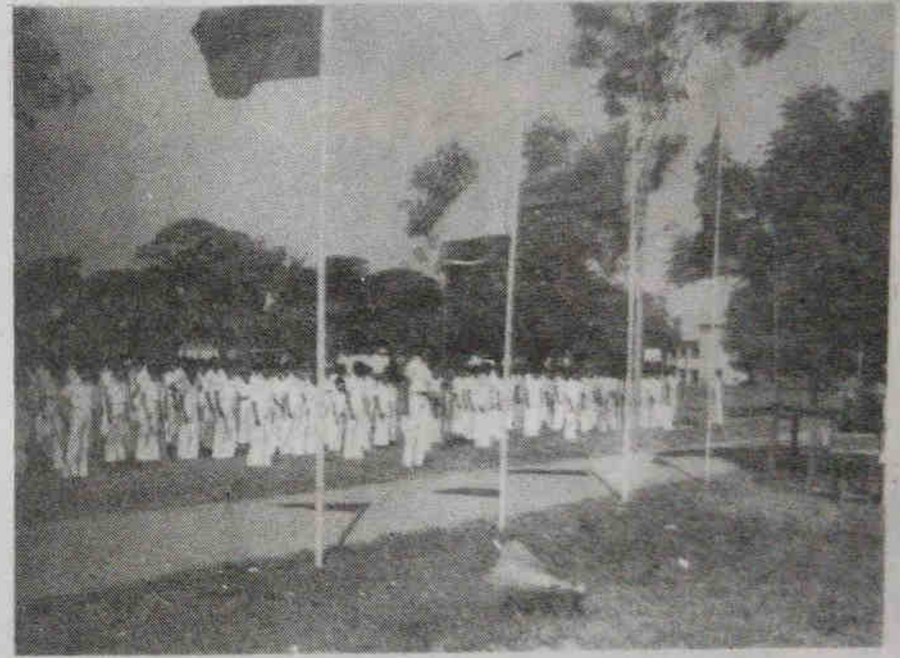

সহপাঠ্যক্রম ক্রিয়াকলাপ

Religion imparts a peculiar angle of thought and life to man This helps him to formulate his system of life and to harmonise various departments of life. Religion on the one hand, tells ways and means to seek the good will of God, on the other hand, it helps in the establishment of a balanced society. It isntructs in shaping human life in this world as well as in the here after. Religion breeds morality. Morality, until and unless is backed by religion, has no force. Religion instructs man to keep away from evil path and to walk on a straight, up right, just and good path. The rise and fall of nations, is also dependent upon the religions spirit a nation imbibes.

The secular ideologies have miserably failed to gain their hold on human society. They are not permanent in nature, these stand for the division of life and not for the unity of life.

Toynbee opines that religion only can secure your emancipation in this atomic age where in every attempt is being made to divide life in to departments instead of unifying these departments in to a whole. Materialistic solutions of problems has failed and all the false promises of secular philosophies have been exposed. The human ills can not be cured, in the absence of God. The greatest need of the present day is the promotion of faith in an omnipotent God.

If amity and peace among nations is to be promoted it is a must that religion be the binding force between one nation and the other.

The necessity of religion can be sumed up in the following manner :—

(1) Religion is the natural urge of man. Man has to satisfy his body as well as his soul. Religion satisfies his soul, solves his problems and he gets consolation.

(ii) In hours of grief, man gets consolation from religion. Those who are aggrived in this world there are rewards for them in the other, world. Autumn must be followed by Spring. The spring of hope is eternal. And this hope comes from religion. If an athiest suffers miserebly, he may commit suicide. There is no other course for him. He has no God to depend upon and therefore no conception of patience.

(iii) Islam tells us that all the objects of this universe have been created for man. Man is the superior. Men have no need to worship animals, plants, birds and other objects nature. These

objects are meant to serve him. Man should not humilate himself by bowing down before them.

(iv) Religion tells man that when he returns back to his Master he will have to give account of his deeds. The fear of punishment stops him from committing excesses in this world. He refrain from crimes, sins and immoral actions which cause displeasure of God.

(v) Religion helps man in balancing the worldly and other worldly affairs Islam preaches a philosophy of Golden means, neither too much worldly nor too much other worldly. One has to work hard for his livelihood and at the same time has to go to prayers.

(vi) Religion prescribe a complete code of human life and therefore one can go on its path without fear and will not falter. For the organisation & consolation of human life, religion is a necessity.

Importance of religion to day :—In the world of to-day according to "Toynbee" religion proves to be the greatest force, the relinquisher, and there deemer of man kind. To-day when life may be divided into different departments, religion is trying its level best to provide for a unifying force. With scientific advancement the world is becoming more and more materialistic.

In this complexity of situation religion seems to be the only hope of mankind, religion alone can inpress upon human beings the human virtures of kindness, brother hood, unity, social service etc. The importance of religion also lies in the fact that it is a natural urge and there fore the human beings who may be for the time being loitering aimlessly must come back to the fold of religion in the end. Religion has also potintiatities and it can boldly face the challenge of materialism and communism. Islam is the most perfect religion so it can face the challenge in a still better way.

The people who do not be tieve in God or gods bt only recognise their capacities follow secularism, materialism and communism.

Islam is a challenge to communism in the sense that it declares that the economic laws are not every thing and naked materialism is no solution to fundamental problems of human beings. Hunger and sex, may be two fundamental problems for the communist but they are not the fundamental problems of man. According to Islam man's life does not revolve round two problems namely hunger and

sex but man is some thing very high in status, the most superior. Why should be bother for these two things when everything in this world has been created for the pleasure of man himself ?

Islam is capable of meeting the challenge of communism & western democracy since it is armed with all the weapons which can destroy the evils bred by these systems and because it has got its own social, economic and political system.

Capitalism and socialism believe in economic and material interpretation of history. But Islam believes in human inter pretations of history and suggests ways and means to build up a harmonised and balanced society. Islam as a human religion does not allow one to profit from the misery of the needs of others.

In a capitalistic society, there is no guarantee of food, clothing and shelter to every body, but it is the Islamic duty of every Muslim Government to see that the basic needs of life are provided to all the citizens of the Islamic State.

Ali Mohammad
Class XII (Hum)
School No. 910

REACTION SPEED TEST

How fast can you touch each squre in numberical order ?

4	3	10	12
6	11	8	9
1	7	2	5

WITHIN 9 SECONDS ? Your reflexes are about overage.

WITHIN 7 SECONDS ? Very good.

WITHIN 5 SECONDS ? Excellent.

MORE THAN 9 SECONDS ? Your reactions are too slow.

RESIDENTIAL MODEL SCHOOL, DACCA-7

LIST OF INSTRUCTIONAL STAFF

1.	Col. Ziauddin Ahmed, M.Sc.	Principal
2.	Mr. S. M. Zahurul Hoq, B. Sc. Hons., M. Sc. Trained in the U. K. in Pub. School Teaching and Administration.	Vice-Principal
3.	Mrs. Shahan Ara Begum, B.A., B.T.	Headmistress (Junior wing)
1.	Mr. A. K. Azadul Kabir, M.A. (Double)	Senior Lecturer
2.	Mr. Md. Shamsul Haque, M.Sc.	do
3.	Mr. M. A. Rouf, M.Sc.	do
4.	Mr. Sk. Md. Omar Ali, M. A., B. T. Dip-in-Eng. Teaching (London)	do
5.	Mr. M. Ahsanullah, M.A., B.Ed.	do
6.	Mr. A. S. A. I. K. Eusufazi, B.A. Hons. M.A. Dip-in-Eng. Teaching (U. K.) Sophomore Course in Edn. (Beirut)	do
7.	Mr. Kazi Rezaul Islam, M.A.	do
8.	Mrs. S. J. Mansur, M.A., B.T.	do
9.	Mr. A. K. M. A. Mannan, M.A. (Edn.)	do
10.	Mrs. R. N. Huq, M.A., B.Ed.	do
11.		
12.		
13.		
14.		
1.	Mr. Md. Shamsur Rahman, B. A. Hons. M. A. (Double), M.A. (Edn.)	Junior Lecturer
2.	Mrs. D. R. Islam, M.A. B.Ed.	do
3.	Mr. A. B. M. A. Mannan, B.A. Hons., M.A.	do

4. Mr. Anwar Rahman, M.A. M.Ed.	Junior Lecturer
5. Mr. P. K. Guha Neogi, M.A.	do
6. Mr. Md. Ataul Haque, M.Sc.	do
7. Mrs. Hasna Aziz, M.A.	do
8. Mrs. Roushan Ara Begum, M.A. Ed.	do
9. Mr. M. A. Razzaque, M.A.	do
10. Mrs. U. S. Chisty, M.A.	do
11. Mr. Ghulam Murtaza, M.Sc.	do
12. Mr. Syed Sabbir Ahmed, M.Sc.	do
13. Mr. Md. Faizur Rahmah, M.Sc.	do
14. Mr. Towfique Khan Mazlish, M.A.	do
15. Mr. A. T. M. Jalaluddin, M.Sc.	do
16. Mr. Syed Mazharul Islam, B.A. Hons., M.A.	do
17. Mrs. Rahman Shahin, M.A.	do
18. Mr. Nazrul Islam Bhuiyan, M.Sc.	do
19. Mr. Md. Suzauddowla, M.Sc.	do
20. Mrs. Dilara Beaum, B.Sc. B.Ed.	do
21. Mrs. Shamim Rahaman, B.Sc. B.Ed.	do

ART, CRAFT & PHYSICAL EDUCATION

1. Mr. M. Aminul Islam, Dip in Fine Arts.	Junior Lecturer—Art
2. Mr. K. K. Sarkar, Dip-in-Commercial Art.	Junior Lecturer—Craft
3. Mr. Helaluddin Ahmed, B.A., Dip-in-Phy. Ed. Dip-in-Swimming (Patiala), India.	Jr. Lecturer—Phy.-Edn.

LIBRARIAN

1. Shilabrata Chowdhury, M.A. (Library Science)	Librarian

DEMONSTRATORS

1. Mr. Md. Jabber, B.Sc.	Demonestrator
2. Mr. Md. Ahia, B.Sc., LLB.	do

ASSISTANT P. T. I.

1.	Mr. M. A. Salam, Dip-in-Hockey (Patiala), India.	Asstt. P.T.I.
2.	Mr. Z. H. Mahboob Amzad, Certificate in Phy. Edn.	do
3.	Mr. Md. Abu Taher, Ex. E.P.R. (Band Master)	do

ASSISTANT MOULVI

1.	Mr. Md. Loqman Ahmed Amimi, M. M.	Asstt. Moulvi
2.	Mr. Md. Hemayetuddin, B.A. Hons., M.A.	do